সুন্দর জিনিষটা ভেঙ্গে দিলেরে! দিই তুই কিল বসিয়ে! দুর হ! বেবো! মর্! মর্! যম কি তোমায় ভুলেছে। বাঁদর! হতভাগা কবে মর্‌বি! আমার হাড়ে বাতাস লাগবে কবে! তাহ'লে আর দুবেলা গিলিয়ে দিতে হবে না। মর! মর! মর! বেরো! বেরো! বেরো! দুর হ!" তার পরেই আবার প্রহারের শব্দ হইল। এ কি? কে কাকে মারে! তাকি বুঝিতে বাকী আছে? একজন গুণবতী ঠাকুর মা। আর ওই হতভাগা বালকটী অজা। এই গোলমাল শুনিয়া পাশের ঘর হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কিগো চারুর পিশী! কি হয়েছে? তোমার পাথর ভেঙ্গে দিয়েছে বুঝি!"

"হ্যাঁ! একেবারে টুকরা টুকরা করেছে। চোক্ নেই, অন্ধ হয়েছে, ঘোড়া যেন! আহা! আহা! এমন সুন্দর পাথর! আজ ওকে মেরেই ফেল্‌ব।" অজা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাইয়া দরজার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই যায়গাটী তার বসিবার স্থান। এখানে বৃষ্টি তেমন পড়িত না। হায়! হায়! এমন ছেলে কোথায় পিতা মাতার আদরে, ভাই বোনের স্নেহে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে, কত খেলা করিবে, না কোথায় অভাগা বালক দুখের শৈশব কাঁদিয়া কাটাইতেছে! মুখের দুটী মিষ্ট কথা শুনিতে পায় না। পিতামাতার স্নেহ কিরূপ, আদর কিরূপ, তাহা কখনও ভোগ করিল না। যেন কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই ইহার জন্ম হইয়াছে। আহা! যার পিতা মাতা নাই তার কেহই নাই!—সে বসে বসে কাঁদ্‌ছে, এমন সময় মেনা তাহার কান্না দেখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেনা। কাঁদ্‌ছ কেন? কি হয়েছে ভাই অজা?

অজা। মেনা! আমার কপালে রোজই মার আছে। এমন একদিনও হয় নাই যে দিন ঠাকুমার কাছে গাল কি মার খাই নাই। আজ একখানা পাথর আমার হাত হতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে ঠাকুরমা আমায় মেরে ঘর হ'তে বের করে দিয়েছেন। আজ আমায় ভাত পর্য্যন্ত দেবেন না। ভাই! আমি চিরকালই মার আর গাল খাব। আমার আর কেউ নাই। আমি বড় দুঃখী। তুমি, তোমার মা, আর সেই ফল-বেচুনী বুড়ী আমায় ভাল বাস। আর আজ একজন খোঁড়া বুড়োর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সে আমায় অনেক ভাল কথা বলেছে? সে তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছে।

মেনা। কেন, আমি গিয়ে কি করব? আমায় কেন ডেকেছে?

অজা। আমি তাকে তোমার কথা বলেছিলাম বলে সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

মেনা। সে কোথায় থাকে?

অজা। ঐ কোণের ঘরে।

মেনা। তার পা নাই?

অজা। হাঁ তার পা আছে বইকি। কিন্তু সে বলেছে, তার পা দুটো কোন কর্ম্মের নয়। সে তা দিয়ে হাট্‌তে পারে না।

মেনা। আচ্ছা আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যাইতে বলিলে যাইব। তুমিতো ভাই জান মা আমায় সব যায়গায় যাইতে দেন না। তবে আমি যাই। আর কেঁদনা ভাই।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। অজাও এক দিকে চলিয়া গেল। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। একে শীতকাল, তাতে তার গায়ে কিছুই নাই। সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তার এক ধারে বসিয়া ভিজিতে লাগিল। ফলওয়ালী তাহাকে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিল "ওকি বাছা শীতে বৃষ্টিতে ভিজিতেছ কেন? এস এস আমার কাছে এস। আহা! আহা! এমন ভয়ানক শীতে বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখ হবে যে। তোমার নামটী কি যাদু, ভুলে গিছি।" বালক দুঃখের সহিত বলিল "আমার নাম অজা।" বুড়ী বলিল, "বেশ ছোট নামটী। আয় বাছা আয়

আমার কম্বলের মধ্যে আয়। আর এই খাবারটুকু খা। এখন একটু গরম হতে পারবি।”—এই বুড়ীকে সকলে রামতারিণী বলে ডাকে। ছোট বেলায় ইহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে। এ বড় গরিব। ফল বেচিয়া খায়, একলা মানুষ তাহাতেই চলিয়া যায়। ইহার বড় দয়ার শরীর। বিশেষতঃ ছোট ছেলে মেয়ের উপর ইহার বড় মায়া। ছোট ছেলে মেয়ের কষ্ট মোটে দেখিতে পারে না। অজাকে দেখিয়া তাহার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল “বাছা আমার বড় ভিজে গিয়েছ? চোকে জল কেন? কি হয়েছে যাদু, তাই কাঁদ্‌ছ?”

অজা। তুমি বড় ভাল মানুষ। তুমি স্বর্গে যাবে?

বুড়ী। না বাছা! আমি সগ্‌গে যাব এত বড় কি ভাগ্‌গি করেছি?—এই কথা না শেষ না হতে হতেই তার ঠাকুরমার গলা শুনে বেচারা অজা ভয়ে জড়সড় হয়ে বুড়ীর কম্বল মাথার উপর ঢাকা দিল।

অজার ঠাকুরমা বাড়ীর রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যাঁ গা, একটা খোঁড়া হনুমান ছেলে দেখেছ?” বুড়ী তাড়াতাড়ি উত্তর করিল “ওমা হনুমান হবে কেন গা? কখনই হনুমান নয়।”

অজার ঠাকুরমা অবজ্ঞার সহিত বলিল “তোমার চোকের চাউনিটা বড় ভাল দেখ্‌চি! সেটা বাঁদর নয়ত কি। আহা! হা! ছিরি দেখলে চোক জুড়োয়!

বুড়ী। ওমা তার মত ভাল বাঁদর এখানে পাওয়া যায় কি? অমন বাঁদর কার ঘরে আছে? যদি ছিরি দেখলে চোক না জুড়োয়, তবে দেখ কেন গা? না দেখলেইত পার।

“আমি দেখি আর নাই দেখি তোমার তায় কি গা” এই বলিয়া বুড়ো ঠাকরুন রাগে গজ্ গজ্ করে বক্‌তে লাগ্‌লেন। “হ্যাঁ গো হ্যাঁ! আর বলতে হবেনা. চুপ করে থাক। অমন ভাল বাঁদরের আজ-কাল আর ভাবনা নাই। দেখি সে বাঁদরটাকে পাই কি না। দেখব কেমন সে বড্‌ডো ভাল বাঁদর হয়েছে, আসুক সে, আজ বাঁচ্‌তে হবে না।” যখন অজার ঠাকুরমা চলিয়া গেল, সে বলিল, “তুমি কেন বলিলে তুমি আমাকে দেখ নাই।”

বুড়ী।—ও যাদু আমি বুঝি তাই বলেছি? বাছাদের কি হনুমান ব'লতে আছে? ষাট্! ষাট্! ষষ্টির বাছা! হনুমান হবে কেন?—অজা এ কথার উত্তর না দিয়া তার বুকের ভিতর গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

বুড়ী বসিয়া বসিয়া খরিদারের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় অজাকে জিজ্ঞাসা করিল “ও ধন! তোর ঠাকুরমা কি তোকে মারে?”—অজা কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর করিল “হ্যাঁ মারে বই কি? এই দেখ!” এই বলিয়া হাতের যে মস্ত ঘা, তাহা দেখাইল।

বুড়ী। আহা! হা! মরে যাই। ষাট! ষাট! পরাণে কি একটু মায়া নেই। এমন ধারা করে কি মারে। ওমা! ছ্যা! এইবার যখন তোরে মারবে আমার কাছে আসিস। আমি তোকে রাখব। দেখব কে আমার মাণিকের গায়ে হাত তোলে।

বুড়ী অজাকে যে খাবার দিয়াছিল তাই সে খাইতে লাগিল। এখন তার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ হয়েছে অজা এই বুড়ীর কাছে বসে আছে। এদিকে বুড়ী বাড়ী যাবার সময় হওয়াতে আপনার জিনিষ পত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। তখন অজা তাহাকে বলিল—“দেখ আজ হতে তুমি আমার দিদীমা হ'লে, আমি তোমাকে দিদীমা বলে ডাকব।” এখন অজার মনে হইতেছে যে দিদীমাই তাহার সর্ব্ব প্রধান বন্ধু। মেনা যদিও সর্ব্বদাই তাহাকে দয়া করে, সাহায্য করে, কিন্তু দিদীমার মতন কি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? তা কখনই পারে না? এখন

তাহার দিদীমা বাড়ী চলে গেল। সুতরাং সে মুখ খানি ভার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনেক দিন হইল অজা বুড়ো রামদাসের কাছে যায় নাই। কিন্তু মেনাকে না লইযাতো সে যাইতে পাবে না, কারণ রামদাস মেনাকে লইয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে অনেক দিন হইল মেনা অজার কাছে আসে না। কাজেই রামদাসের বাড়ীতে যাওয়া হয় না।

একদিন অজা বসিয়া রোদ পোহাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল মেনা বাড়ী হইতে বাহির হইযা তাহার নিকটে আসিতেছে, তাহার কপালে মস্ত একটা কাল দাগ—অজা বুঝিল তাহার বাপ মাতাল হইয়া মারিযাছে। মেনার মুখখানি দেখিলে বোধ হয় তার যেন কোন দুঃখ হইযাছে। মেনা নিকটে আসিয়া বলিল—"অজা! আজ কাল তোমাকে রোজই এইখানে দেখি।"

অজা। রোজই ঠাকুরমা বিকাল হলে বেড়াতে যান। যাবার সময় আমায় ঘর থেকে বের করে দিযে দুয়ারে চাবি দিয়ে যান। তাই এখানে বসে থাকি, আর কোথা যাব বল।

মেনা। সেই বুড়োটীর কাছে যাবে না? আমায় মা যেতে বলেছেন।

তখন তাহারা দুজনে মিলিয়া রামদাসের ঘরের দরজায় গেল। দরজা খুলিয়াই দুজনে ভয়ে ভযে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল—ঘরে ঢুকিতে সাহস পাইল না।

রামদাস দেখিতে পাইযা বলিলেন—"এসো, এসো, ভিতরে এস। আমি মনে করিতেছিলাম তুমি আমায় ভুলে গেছ। আজি, অনেক দিন পরে।

অজা।—না, না! ভুলি নাই। কিন্তু মেনা এতদিন আসিতে পারে নাই, তাই আমারও আসা হয় নাই।

রামদাস।—এই বুঝি মেনা! আমি তোমায় দেখে বড় খুসী হলাম। তোমার কপালে কিসের দাগ বাছা! পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? "না—পড়ে যাইনি—" আস্তে আস্তে থেমে থেমে মেনা এই কথাগুলি বলিল।

রামদাস স্নেহভরে মেনার মাথা ধরিয়া বলিলেন "দেখি মা! দেখি। আহা বড় লেগেছে না? খুব ভুগেছ না?—আহা! ভগবান তোমায আশীর্ব্বাদ করুন।"

মেনা। মা আমায রোজ রোজ ঈশ্বরের কথা বলে উপদেশ দেন; আমায় ভাল হতে বলেন।

রামদাস তাদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন—"বেশ! আজ তোমার মা তোমায় কি বলেছেন?"

মেনা। মা আজ আমায বলেছেন ভাল না হলে মানুষ ঈশ্বরকে পায না। আর আমাকে বলেছেন, তুমি ভাল হবার জন্য খুব চেষ্টা ক'র আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'র।

রামদাস। আহা! বেশ কথা! দিব্যি কথা! তোমার বড় ভাগ্যি যে এমন মা পেযেছ। আহা! ভাল মা পাওয়া কত সুখ! বাছা, যখন বড় হবে, তখন বুঝবে, যে এমন মা পেযে তুমি কতদূর সুখী হযেছ।

মেনা মাযের সুখ্যাতি শুনিযা মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এদিকে অজা মেনার কানে কানে বলিল- "চল ভাই! আর দেরী ক'র না। চল! ঠাকুমা বকবেন।"

মেনা রামদাসকে বলিযা অজার হাত ধরিযা বাহির হইল। আসিবার সময় রামদাস বলিয়া দিলেন—"আর একদিন এসো বাছা।"

ক্রমশঃ।

"এই সুখই বুঝি স্বর্গ"?

নলিনকে আজ বাড়ী শুদ্ধ সকলে খুঁজিতেছে, কোথাও পাইতেছে না, বালক আজ নিজের পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া করযোড়ে

কি করিতেছে আর কাঁদিতেছে। মা টের পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বাছা, কি হইয়াছে? কেহ কি মারিয়াছে, না গালি দিয়াছে?" নলিন মার কোলে উঠিয়া বলিল "না মা কেহ আমায় কিছু বলে নাই। আমি আজ খেলিতে খেলিতে ও পাড়ায় গিয়াছিলাম, গিয়া নারাণদের বাড়ীতে একটু বসেছি আর দেখি নারাণের মা, আহা! সে বোল্‌তে পারি না। বুড়ো রোগা, যেন মড়ার মতন ঠিক মা! একটা লাটী হাতে কোথা থেকে এলেন। দেখে আমার এমনি দুঃখ হ'ল তা আর বলা যায় না। তা আমি জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পার্‌লাম, যে তিনি ভিক্ষা করিয়া আসিলেন। হাতে একটী ছোট ধামী, তাহাতে দুটীখানি চাল আর কোঁচড়ে দুটো আঁব। সেগুলি ঘরে রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর সেই চালগুলি সিদ্ধ করিয়া দুজনে সেই দুটী আঁব দিয়ে ভাত খেলেন, তখন বেলা ৫ পাঁচটা, মা। আমার তখন দুবার খাওয়া হইয়া গিয়াছে। মা, আমি শুনিলাম তারা রোজ অমনি কোরে দিন কাটান। মা, তাদের এত কষ্ট, আর আমি কত সুখে, কত তরকারী, ডাল, ঝোল, দুধ, কতো কি দিয়ে দুবার ভাত খাই। আর কত খাবার খাই। আর আমি তা খাব না। এখন অবধি আমার খাবার থেকে অর্দ্ধেক আর তোমার খাবারের অর্দ্ধেক মা! নারাণকে আর তার মাকে দিতেই হবে, এ না হ'লে আর আমি শুন্‌বো না।" এই বলিয়া মার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পরের দুঃখে দুঃখ দেখিয়া মাও থাকিতে পারিলেন না। তিনিও খুব কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর সন্ধ্যার সময় চাকরকে দিয়া এক ধামা চা'ল এক হাঁড়ি ডা'ল ও অন্যান্য কত সামগ্রী এবং প্রায় ৫০টী আম্র এই সকল লইয়া নলিন ও তাঁহার মা নারাণদের কুঁড়ে ঘরে এসে বসিলেন। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া কোথায় বসাবেন, কি কোর্‌বেন, কিছু ভেবে ঠিক কোর্ত্তে পারেন না। নলিনের মা নারাণকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন, তাহার দুঃখিনী জননী তাহা দেখিয়া আনন্দে ও উপকারে মোহিত হইয়া যেন কি হইয়া গেলেন। ঝর্ ঝর্ করিয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দের জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভক্তিভরে নলিনের মার পায়ের তলায় আসিয়া পড়িলেন:—"মা তুমি কি দেবী না মানবী? কখনই মানুষ নও, নিশ্চিত তুমি দেবতা, মানুষের মনে তো এমন দয়া কখন দেখি নাই। ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন।" নলিন নারাণের গলা ধরিয়া তাহার বুকে আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল:—"ভাই নারাণ! তুমি আমার ভাই, আমার মায়ের পেটের ভাই! আর তোমার কষ্ট কোর্ত্তে হবে না। কাল থেকে তুমি আমাদের পাঠশালে যেও, আমি বাবাকে বোলে তোমার মাহিনা দিব।"

এইরূপে অনেক রাত্রি অবধি নারাণের মাকে শান্ত করিয়া সেই সব সামগ্রী তাহাদের ঘরে রাখিয়া নারাণকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া তাঁহারা বাড়ী গেলেন। আহা! সে রাত্রি গরিব নারাণ ও তাহার মার কি আনন্দ! সে দিন আবার নলিন ও তাহার মার আরও কত বেশী আনন্দ! বাস্তবিক বলিতে কি, যে উপকার করে, যে দুঃখীর দুঃখ দূর করে, যে অসহায়ের সহায় হয়, যে অনাহারীকে আহার দেয়, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? যে উপকার পায় তাহার যে সুখ, তাহার অপেক্ষা হাজার গুণে সুখী সে যে উপকার করে।

সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে যাইতে নলিন স্বপ্ন দেখিল যেন তাহারা খুব গরিব হইয়া গিয়াছে, খেতে পায় না, পথে শুইয়া রাত্রি কাটায়। আর নারাণ খুব বড় মানুষ হইয়াছে, একদিন সে পথে নলিনকে কাঙ্গাল বেশে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাকে লইয়া বাড়ী গেল এবং তাহার সমস্ত টাকা, সিন্দুক পোরা পোরা মোহর, রাশি

রাশি সোণার গহনা, অগণ্য দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ী সমস্ত নলিনকে দিয়া বলিল "ভাই! বাল্য-কালে তুমি যে পরম উপকার করিয়াছ তাহার শেষ নাই। এক্ষণে তোমারই এ সব; আমি তোমার ছোট ভাই, আজ্ঞার অধীন। আমাকে যা বলিবে তাই শুনিব। তুমি ও তোমার মা এ বাটীর প্রভু, আমরা তোমাদের দাস দাসী।" আহ্লাদে নলিনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে মনে ভাবিল "ইহাই বুঝি সৎকর্ম্মের পুরস্কার, এই সুখই বুঝি স্বর্গ।"

আমাদের মহারাণী।

আমাদের দেশের রাজা ইংরাজেরা। তাই বলিয়া যে সকল ইংরাজই আমাদের রাজা তাহা নহে। আমাদের রাজা যিনি, তিনি ইংলণ্ডে থাকেন। অনেক যায়গাতেই তাঁহার রাজত্ব। তিনি ইংরাজদেরও রাজা, আমাদেরও রাজা। এখন যিনি আমাদের রাজা তিনি স্ত্রীলোক। ইহাঁর নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়া। মহারাণী ইংরাজ স্ত্রীলোক বলিয়াই যে সকল ইংরাজ আমাদের রাজা বা আমাদের কর্ত্তা তাহা নয়। মহারাণীর চক্ষে আমরাও যেমন, সাদা ইংরাজেরাও তেমনি। তবে কেন যে সে ইংরাজ আসিয়া আমাদের ভয় দেখাইবে? আমাদের রাজা বলিয়া অত্যাচার করিবে? আমদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে? আমরা উহাদের ভ্রূকুটিতে ভয় পাইব না। যে সে ফিরিঙ্গী, যে সে চুনাগলির পচা সাহেব আসিয়াই যে আমাদের দেশের রাজা বলিয়া অহঙ্কার করিবে, অত্যাচার করিবে তাহা আমরা কখনও সহ্য করিব না। [illegible] [illegible] ভ্রূকুটিতে কেন ভয় পাইব? কেন উহাদের অত্যাচার সহ্য করিব? ওরা আমাদের রাজা বলিবার কে? উহারাও মহারাণীর প্রজা, আমরাও তাঁহার প্রজা; তাঁহার চক্ষে উহারাও যেমন আমরাও তেমন।

মহারাণী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ মে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এড্‌ওয়ার্ড ডিউক অফ্ কেণ্টের একমাত্র সন্তান। ইহাঁর মাতার নামও ভিক্টোরিয়া। ইনি যখন এক বৎসরের বালিকা তখন ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তখন হইতেই সকলে মনে করিয়া আসিতেছিলেন যে ভবিষ্যতে ইনি আমাদের মহারাণী হইবেন। তখন হইতেই ইহাঁর মাতা ইহাঁকে রাণী হইবার মতন নানা গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

মহারাণী এমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগের মহারাণী হইয়াও অহঙ্কার করেন না; মহারাণী বড় বিনয়ী। তিনি অতুল ধনের অধিকারিণী হইয়াও নানা বিদ্যায় বিভূষিতা। চিত্র বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইহাঁর বেশ ভাল জানা আছে। আমাদের দেশের যে সকল লোক পিতার বিষয় কিম্বা একরাশ টাকা হাতে পান তাঁহারা প্রায়ই আজন্ম লেখা পড়া করেন না। গণ্ডমূর্খ থাকিয়া পিতার ধনে বাবুগিরি করেন, আর কত সব অসৎকার্য্যে ব্যবহার করেন; সৎব্যবহার ছাড়িয়া ধনের অপব্যয় করিয়া দুদিনে সমস্ত টাকা উড়াইয়া দেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি ইহাঁরা কি মহারাণীর চেয়েও বড়মানুষ, তাই তাঁদের লেখা পড়ায় কাজ নাই? লজ্জাও করে না! বিদ্যা কি কেবল ধনের জন্যই? না, বিদ্যার আরও সৎব্যবহার আছে? মূর্খের ধন বানরের হাতের মুক্তার হারের মত। বানর যেমন মুক্তার গুণ জানেনা, ব্যবহার জানেনা, মূর্খ ধনীও সেই রূপ। যে দেশের পুরুষের এই দশা, যে কিছু টাকা থাকিলে লেখা পড়া করে না, সে দেশের মেয়েদের কথাত ছেড়েই দাও। কিন্তু মহারাণী মেয়ে হয়েও, অতুল ধনের অধিকারিণী, প্রকাণ্ড দেশের মহারাণী হয়েও অতি যত্নে নানা বিদ্যা শিখিয়াছেন। আমাদের মহারাণী বড় গুণবতী;

তাঁর মন খানি দয়ায় মাখা। আমাদের রাণী বড়ই ভাল। লোকে অনেক ভাগ্য করিলে এমন রাণী পায়। যে দেশের রাজা কি রাণী এমন ভাল সে দেশের সৌভাগ্য অনেক।

পাঠক পাঠিকা! আমরা তোমাদিগকে মহারাণীর বিষযে কযেকটী ঘটনা বলিব; তাহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে মহারাণীর মন কত বড়, এবং তিনি কেমন লোক।

(১) একদিন মহারাণী জানিলেন যে এক জন দুঃখিনী বৃদ্ধা মরিযা যাইতেছে। নিকটে এমন কেহ নাই যে সেখানে গিযা বৃদ্ধাকে মরিবার সময় দুটো ধর্ম্মের কথা শোনায়। শুনিযা তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কুটীরে গিযা তাহার বিছানার পাশে বসিলেন এবং উপাসনা করিযা তাহাকে বাইবেল পড়িযা শুনাইলেন।

(২) এক নৈতিক বিদ্যালযে মহারাণীর ছেলে মেয়েরা ছেলেবেলায় পড়িতেন। একদিন এক জন লোক মহারাণীর ছেলে মেযেদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা সব গুলিরই খুব ভাল উত্তর দিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তোমাদের শিক্ষক খুব ভাল শিখাইযাছেন।" তাহাতে তাহারা বলিল "আমাদের মা শিখাইযাছেন, শিক্ষক শিখান নাই।"

(৩) রাণী যখন পল্লীগ্রামে গিযা বাস করিতেন, তখন তিনি প্রাযই সামান্য লোকের মত পোষাক করিয়া গরিবের ঘরে গিযা তাদের উপকার করিতেন, তাদের দুঃখের কথা শুনিতেন, আরও কত সময় ছদ্মবেশে যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন তাহার ঠিক কি?

(৪) একদিন মহারাণী ছদ্মবেশে এক জহুরীর দোকানে গিযাছিলেন। সেখানে দেখিলেন এক জন স্ত্রীলোক একছড়া মুক্তামালার দর করিতেছেন। সে সময়কার বিবিরা স্বামীর অবস্থা না বুঝিয়া অনেক দামী জিনিষ পত্র কিনিতেন এবং স্বামীর নামে খাতায় বাকী লিখাইযা বাড়ীতে চলিয়া আসিতেন। এ দিকে মাসের শেষে স্বামীর নামে হিসাব গেলে বেচারা স্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত। এইতো ব্যাপার। মহারাণী আসিয়া দেখিতে লাগিলেন এই স্ত্রীলোকটী সেই রকম কি না। কিন্তু তিনি দেখিযা সন্তুষ্ট হইলেন, যে স্ত্রীলোকটী হারের দর শুনিযা "অত টাকা দর দিবার মত আমার অবস্থা নয়," এই বলিযা চলিযা গেলেন। স্ত্রীলোকের এইরূপ সুবিবেচনার পুরস্কার হওয়া উচিত, ইহা ভাবিযা মহারাণী সেই মালাছড়া পরে কিনিযা লইলেন, এবং সেই বিবিটীর নিকট নিজের নামে পাঠাইযা দিলেন।

(৫) একদিন এক যায়গায সাহেব বিবিদের নাচ হয, নাচের উদ্যোগীরা অনেক করে মহারাণীকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে লইযা যান। কিন্তু মহারাণী ঘরের মধ্যে কিছুকাল থাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তাহা দেখিযা তাঁহারা আশ্চর্য্য হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফিরিয়া যান কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "এখানে মেযেরা এমন বেহাযা পোষাক পরিয়া আসিবে তাহা জানিলে আমি আসিতামই না?" মহারাণীর এই এক কথায সেই দিন হতে পোষাকের শ্রী বদলিযা গেল।

(৬) একবার একজন লোক মহারাণীকে গুলি করিযা মারিযা ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মহারাণী বাঁচিযা গিযাছিলেন। একটী মেয়ে তার বাবার কাছে এই কথা শুনিয়া মহারাণীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখে যে "আমি বাবার কাছে শুনিয়াছি আপনাকে একজন লোক গুলি করিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আপনি এত ভাল তবে কেন আপনাকে লোকে মারিতে আসে। আমি আপনাকে বড় ভাল বাসি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই—যে আপনি বেঁচেছেন।" রাণী এত বড় লোক, তবুও এই সামান্য পত্র পাইয়া আহ্লাদিত

সন্তুষ্ট হইলেন। আর মেয়েটীকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৭) একদিন রাণী গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন, রাস্তায় একজন মুটে কাঠ লইয়া যাইতেছিল, সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কাঠ নামাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে। তাহা

দেখিয়া রাণীর অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া কাঠগুলি গাড়ীর উপর উঠাইয়া তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া তাহার যাইবার যায়গায় পৌঁছিয়া দিলেন। দেখ! মহারাণী কত মহৎ।

আমাদের এমন মহারাণীর বয়স এখন ৬৫ বৎসর। আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের দেশের উপকার করুন, ইহাই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

জ্ঞানই সূর্য্য।

মরা কি কখন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছ? কখন কি ভোরে ঘোর ঘোর থাকিতে বাহির হইয়াছ? তাহাহইলে অবশ্য দেখিয়া থাকিবে যে যতক্ষণ অন্ধকার থাকে ততক্ষণ যেন আকাশের ও পৃথিবীর কেমন কেমন ভাব। ঝোপে ঝোপে, গাছতলায় অন্ধকার, যাইতে ভয় করে, কি জানি যদি তথায় সাপ টাপ থাকে ত কামড়াবে? পাছে কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সে সময় কোথাও যাওয়া যায় না, কোন কায করা যায় না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হয়। যেন আমরা চলিতে জানি না, যেন পৃথিবী আমাদের বেড়াবার স্থান নহে, যেন ঘরে থাকিবার জন্যই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। আর যেমন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিক ফরসা হয়, যেমন ক্রমে ক্রমে সূর্য্য উঠিতে থাকে, অমনি অন্ধকার পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়। আকাশের নক্ষত্রগুলি আর দেখা যায় না, সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকের অভাবে যাহারা, যে অগুন্তি নক্ষত্রগুলো মিট্ মিট্ কোরে জলছিলো, তাহারা আর এখন সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর তখন তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। এদিকে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আলোক পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। কাজেই যে সকল গাছতলায় এতক্ষণ যাইতে পারিতেছিলাম না সেখানে যাইতে আর ভয় হয় না। যে সব স্থানে এতক্ষণ অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করিতেছিল, সে সকল স্থানে এখন দিব্বি আলো ফুট্ ফুট্ করিতে লাগিল। কেমন সুন্দর! এই ত গেল, একদিকে অন্ধকার দূর হইল; আবার আর একদিকে যেখানে কিছু নাই বোধ হইতেছিল, সেখানেও কত সামগ্রী দেখা দিল। কেমন সুন্দর শ্যামল বৃক্ষের পাতাগুলি—তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া চিক চিক করিতেছে, কেমন সবুজ মখমলের বিছানার মত দূর্ব্বাঘাস গুলি ভূমিতল ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কেমন ছোট ছোট রাঙ্গা, সাদা, হলুদ, নীল নানা প্রকার বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়াছে তাহাতে আবার গুণগুণ করিয়া মৌমাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বসিয়া ছোট শুঁড়টী দিয়া মধু চুষিয়া লইতেছে। কত শত পাখী, তারা সব এতক্ষণ বাসায় নিদ্রিত ছিল, এখন মহা আনন্দে বাহির হইয়া গান করিতে করিতে কচি কচি ছানাদের জন্য খাবার দ্রব্য আনিয়া ঠোঁটে করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ঠোঁটের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। এক শ, এক হাজার, কত জিনিষ সব দেখা যায়—যখন সূর্য্যটী আকাশে উঠে। আর যতক্ষণ তা হয়নি ততক্ষণ রাত্রি, অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

মানুষের মনে জ্ঞানও ঠিক এইরূপ সূর্য্যের মত। যতদিন তাহার মনরূপ আকাশে জ্ঞান সূর্য্যের উদয় না হয়, যতদিন মনে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন মন অন্ধকার থাকে, কিছু দেখা যায় না, কোন বস্তুর গুণাগুণ জানা যায় না। কাজেই মনে নানা প্রকার ভয় হয়। যে জানেনা, যাহার কোন জ্ঞান নাই, সে ত মানুষই নয়। আবার যতদিন না জ্ঞান-সূর্য্য উঠে ততদিন মানুষের মনে নানা প্রকার কুচিন্তা, কুভাবনা, অনেক রকম কু-আশা

কত প্রকার লোভ, অসংখ্য নক্ষত্রের মত মনের আকাশকে ছাইয়া রাখে। যেই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় অমনি ঐ সকল নক্ষত্র আর জ্ঞানের জ্যোতি সহিতে না পারিয়া পলায়ন করে। তাই দেখা যায় অজ্ঞানাবস্থায় যাহারা দুষ্ট থাকে বড় হইয়া জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা ভাল হয়। অজ্ঞানে যাহারা অসচ্চরিত্র থাকে জ্ঞান পাইলে তাহারা পণ্ডিত, বিবেচক ও সাহসী হয়। যত দিন মানুষের জ্ঞান থাকেনা ততদিন কত জিনিষ মানুষ দেখিতে পায়না। মেঘ হয় কেন? পৃথিবী কি? গ্রহ উপগ্রহ কি? সূর্য্য কি? এ সকল বিষয় কিছুই না জানিয়া মূর্খ স্ত্রীলোকদের মতন কত কি ভুল ভ্রম লইয়া থাকে, তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া এ সকল বিষয় ঠিক বুঝিতে পারিয়া কত সুখ, কত আমোদ, কত আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

তাই বলি "জ্ঞানই মনাকাশের সূর্য্য।" জ্ঞান না হইলে মানুষই হওয়া যায়না, জ্ঞান না হইলে মানুষ পশু দুইই সমান। জ্ঞান না পাইলে চরিত্র ভাল করা যায় না, কখনও সৎ হওয়া যায়না। জ্ঞান না পাইলে কোন কার্য্যই করা যায়না, কোন পথ চেনা যায় না। অতএব তোমরা সকল সুখ, সকল আহ্লাদ আমোদ, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, সকল বিষয় অপেক্ষা এই সর্ব্ব সুখের মূল, সকল কার্য্যের আদি, জ্ঞানকে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হও। আলোক না থাকিলে, সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবী যেমন, জ্ঞান অভাবে মনুষ্যও ঠিক তেমনি হয়। শিশুগণ! প্রাণ পণে জ্ঞান লাভের জন্য মন দাও। "জ্ঞানই মনাকাশের সূর্য্য"।

আমাদিগের পুরস্কারের বিজ্ঞাপনের ফল।

আমরা বালক বালিকাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য স্বীকার করিয়াছিলাম যে (১) বার বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকা যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ধাঁধার উত্তর দিতে পারিবেন, বর্ষশেষে তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে (২) ১৬ বৎসরের কম বয়সের বালক বালিকা, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র করিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং (৩) যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেও একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এই রচনার মধ্যে তিনটী শ্রেণী ছিল—(ক) ৮ থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, (খ) ১১ থেকে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, (গ) ১৪ থেকে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ৭ই জুন চিত্র এবং রচনা পাঠাইবার শেষ দিন ছিল। সুতরাং বোধ হয় বালক বালিকাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে পুরস্কার কে পাইল। ধাঁধার পুরস্কার বৎসরের শেষে দেওয়া যাইবে, সুতরাং কেবল চিত্র ও রচনার পুরস্কারের কথা বলা যাইতেছে।

১। চিত্র।—৯জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঢাকা নিবাসী শ্রীমান বিনয়চন্দ্র গুপ্ত (বয়স ১৪ বৎসর) প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমান সেখ সমসুদ্দীনের চিত্র মন্দ হয় নাই, তবে প্রথমটীর মত নয়, সুতরাং আমরা প্রথমটীকেই পুরস্কার দিব।

২। রচনা।

(ক) এই বিভাগে কেহই পরীক্ষা দেয় নাই।

(খ) রচনার বিষয়—"একটী ছোট মেয়ে মরে গেছে; তার মা তার পাশে বসে দুঃখ করিতেছেন।" এই বিষয়ে পদ্য।

সর্ব্বশুদ্ধ ৮ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে মোটের উপর শ্রীমতী সরলা দেবী (বয়স ১১ বৎসর ৯ মাস) প্রথম হইয়াছেন। তাঁহার রচনাটী প্রকাশ করা গেল। এই বিভাগের আরও দুজনের রচনার ভাল অংশগুলি তাঁহাদের উৎসাহের জন্য প্রকাশ করা গেল।—

"প্রাণের বাছারে মোর, হৃদয়েরি ধন!
মা বলে আয়রে কোলে জুড়াক্ জীবন।

তেমনি সুধার স্বরে একবার কথা ক'রে।
কেন মুখে নাই তোর একটী বচন?
কোথা সেই হাসিরাশি খেলাধুলা সব?
উঠ যাদু, প্রাণ যায় দেখিয়ে নীরব!
আকুল প্রাণের মাঝে আয় প্রাণধন!
আয় আয় প্রাণভোরে বুকেতে চাপিয়া ধ'রে
ও চাঁদ মুখেতে তোর করিবে চুম্বন।
তবু কথা কহিলিনে? তবু কেন জাগিলিনে
এখন রহিলি যেরে মুদিয়ে নয়ান!
কি দশা হয়েছে মার দেখ চেয়ে একবার
কি দোষ হয়েছে—কেন হেন অভিমান?
মায়ের প্রাণের বাছা কোথা ছেড়ে যাবি?
দিব না যাইতে তোরে বুকেতে রাখিব ধ'রে
হৃদয়ের দেবী হৃদি উজলি রাখিবি।
সাধের প্রতিমা! তোরে দিয়ে বিসর্জ্জন
কেমনে, কি লয়ে, আর ধরিব জীবন?
প্রাণের আলোক তুই, জীবন আমার,
ও আলো নিভিলে সব আঁধার আঁধার।
ত্যজিয়া এজন্মভূমি ভুলি এ মায়েরে তুমি
কোন্ জননীর কোলে লভিবে বিরামে?
জনম লইতে যাস্ কোন্ পুণ্যধামে?
অগণন দেব দেবীগণ আলোকের—
যেথায় খেলিছে বসি চরণে মায়ের,
চেয়ে সে মায়ের পানে কচি মুখে কচি প্রাণে
হাসিতে যাস কি ধন তুই (ও) সেই লোকে?
আমিও যাইব ওরে নিয়ে যাবে সাথে করে
একেলা যাইতে ছেড়ে দিবনারে তোকে!"

শ্রীসরলা দেবী।
কলিকাতা।

"কেন একাকিনী পড়ে নীরবে শয্যায়!
সুখের খেলার কাল বৃথা বয়ে যায়।
উঠ বাছা, একবার চাও আঁখি মেলি,
কোলে বসি একবার ডাক 'মা' 'মা' বলি।
আর কি ও চাঁদ মুখে কথা না শুনিব?
আর কি সোনার চাঁদে কোলে না করিব?
উঠ উঠ প্রাণ-ধন! উঠ একবার
তোমার বিহনে দুঃখ নাহি সহে আর।
হের দেখ তব মা তোমায় হয়ে হারা,
দুঃখে তাপে হইয়াছে পাগলিনী প্রায়।"

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
শালডাঙ্গা।

"কি খেয়ে এখন আমি বাঁচিয়া থাকিব?
কেমনে এ পোড়া প্রাণে অন্নজল দিব?
আয় আয় কোলে আয় ওরে যাদুমণি!
কাঁদে তোর মুখ চাহি অভাগা জননী।
খাওয়া পরা কাজ কর্ম্ম যে কিছু আমার—
যে কিছু আছিল সব লাগিয়া তোমার—
এবে যে হইল বাছা সকলি নিঃশেষ,
মায়ের কপালে এই ছিল অবশেষ!
মানুষের হাত নাই বিধাতার বিধি।
আমিও যাইব চল তুই গেলি যদি।"

শ্রীরামচরণ চৌধুরী।
নলডাঙ্গা।

(গ) "কাক ডাকিতেছে, জলের মধ্যে তাল গাছ, ঘোড়া ছুটিয়া গেল, ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, বাঘের ভয়, শিয়ালের বাচ্ছা, কি সর্ব্বনাশ! জামাযোড়া, বড় লোক, সাহসী পুরুষ, হৈ হৈ শব্দ, শিকারী"—এই কথাগুলি বজায় রাখিয়া একটী রচনা। এই বিভাগে ৯ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইহাঁদের রচনা প্রায় সমান হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কে প্রথম ইহা স্থির করিতে আমাদের অনেক সময় গিয়াছে। আমরা অনেক ভাবিয়া অবশেষে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে প্রথম স্থান এবং হিরণ্ময়ী দেবীকে দ্বিতীয় স্থান দিলাম। উভয়ের রচনাই প্রকাশ করা গেল। কিন্তু পুরস্কার প্রথম বালক পাইবেন।

১। "আর রাত্রি নাই। ভোর হইয়াছে, "কাক ডাকিতেছে।" অরুণের লাল ছবি জানালা দিয়া ঘরে আসিয়াছে। আমি তখনও শুইয়া আছি। এমন সময় বোধ হইল আমাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া "ঘোড়া ছুটিয়া গেল।" তাহার সঙ্গে আবার "হৈ হৈ শব্দ।" সেই শব্দে ভীত হইয়া "ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল।" সেই সময়ে আমাদের গ্রামে বাঘের ভয় হইয়াছিল, মনে করিলাম হয়তো কোনও "শিকারী" বাঘ শিকার করিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদিগকে দেখিব বলিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া বাড়ীর সম্মুখের পুকুর ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুকুর ধারের তালগাছগুলি জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন "জলের মধ্যে তালগাছ" হইয়াছে। দেখিলাম অনেক লোকজন সঙ্গে একজন ঘোড়সওয়ার যাইতেছেন—তাঁহার "জামাজোড়া" দেখিলেই "সাহসী পুরুষ" ও "বড় লোক" বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এক অনুচর চীৎকার করিয়া বলিল, ঐ বাঘ দেখা যাইতেছে। শুনিয়া অশ্বারোহী সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম "কি সর্ব্বনাশ!" যদি বাঘ ইহাঁকে বিনাশ করে, এমন সময়ে অশ্বারোহী নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, কৈহে বাঘতো দেখিতে পাইতেছি না। এযে একটা "শিয়ালের বাচ্ছা।" অন্যান্য সকলে, যে বাঘ দেখিয়াছিল, তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। এমন সময়, শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত হইলেন, আমি বাটীতে আসিয়া পড়িতে বসিলাম। তাহার পর কি হইল জানি না।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৪বৎসর)
কলিকাতা।

২। "বনগ্রামে বড় বাঘের ভয় হইয়াছে। জমীদার যদুবাবু তাই আজ শিকারে যাইবেন। ভোর না হইতে হইতে শিকারীরা বন্দুক ছুড়িল। ঘরে "ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল," গৃহিণী তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া 'জামাজোড়া' আঁটিয়া শিকারে গেলেন।

ভোর হইয়াছে "কাক ডাকিতেছে।" শিকারীদের যাইবার রাস্তার ধারে ধারে সরসী। তাহার "জলের মধ্যে তাল গাছ," তমালগাছ প্রভৃতির ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, শিকারীরা গ্রামের সেই শোভাময় রাস্তা ছাড়াইয়া জঙ্গলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে, এমন সময় একজন "শিকারী" একটা "শিয়ালের বাচ্ছা" দেখিয়া ওই বাঘ ওই বাঘ বলিয়া ছুটিল, অন্যান্য শিকারীও "হৈ হৈ শব্দ" করিয়া সেই দিকে ছুটিল। বাঘের নামে বাবুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, হাতের বাশ শিথিল হইয়া পড়িল, অবসর বুঝিয়া "ঘোড়া ছুটিয়া গেল।" "কি সর্ব্বনাশ!" বাবু পড়িয়া গেলেন। ইনিই গ্রামে "সাহসী পুরুষ" বলিয়া খ্যাত, কেন না ইনি "বড় লোক"।"

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী (১৫ বৎসর ৫ মাস)
কলিকাতা।
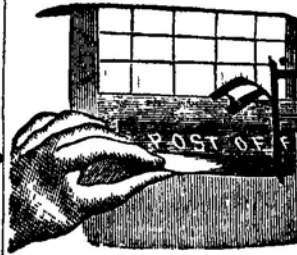
পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত শম্ভুগঞ্জ হইতে সখার একজন গ্রাহক "বালক বালিকার প্রতি উপদেশ" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলামনা। তিনি এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তুলিয়া দিলাম—"সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক "বালক বালিকার প্রতি উপদেশ" আপনার সখায় মুদ্রিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন। আজ প্রায় ১৪। ১৫ মাস যাবত সখা লইতেছি, এলাগাত ১৪ ১৫টী প্রবন্ধ পাঠাইলাম দুঃখের বিষয় তাহার একটীও

মুদ্রিত হইলনা। হা বিধি! * * এই প্রবন্ধ জুলাই মাসে মুদ্রিত হইয়া আসিলে সখার মূল্য পাঠাইব। * * * *। আমার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে এতদিন বহু গ্রাহক যুঠাইয়া দিতাম, তাহাও হ'লনা, আমিও দিলামনা। এইক্ষণ প্রার্থনা যে আমি একজন এজেণ্ট হইব—সথায় আমার নাম ধাম স্পষ্টভাবে মুদ্রিত করিয়া দিবেন।"—আমাদের পত্রপ্রেরক সখার কেমন হিতৈষী! তিনি এতদিন সখা লইয়া মূল্য দিতেছেন না, আর ছাপাইবার উপযুক্ত নয় এমন প্রবন্ধ সকল পাঠাইয়া, না ছাপাইলে বেচারা সম্পাদককে গালাগালি দিতেছেন! আমরা ভাবিয়াছিলাম ইহাঁর নাম প্রকাশ করিবনা কিন্তু এমন হিতৈষীর নাম সকলেরই জানা উচিত; ইহাঁর নাম মহম্মদ জামালুদ্দিন।

শ্রীজয়কিশোর সেন, কাছাড়।—আপনার প্রেরিত 'পাখীর প্রতি অত্যাচার করিওনা" নামক প্রবন্ধটীর ভাষা তত ভাল না হইলেও, ভাবটী বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের একটী প্রবন্ধ এবারকার সখায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আপনার প্রবন্ধটী দেওয়া গেলনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ময়মনসিংহ।—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলের ছাত্রেরা একটী সভা করিয়াছেন, সেখানে একদিন "মাদক দ্রব্য সেবন" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সকলেই 'মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই সভার সভাপতি মহাশয় ছেলেদের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অনেক দিনের তামাক খাওয়া অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামচরণ চৌধুরী, নলডাঙ্গা।—ধূমপানের কি কি দোষ, তাহা গত বৎসর মার্চ্চ মাসের সখাতে লেখা হইয়াছে, তাহাই দেখিবেন।

শ্রীহরিহর মিত্র, কলিকাতা—এ কি রকম পদ্য! না আছে ছন্দ না আছে ভাব? চাঁদ উঠিলে কি 'পদ্মিনী" হাসে? এত বানান ভুল? লিখিলেই যে ছাপাতে হবে, তার কোন মানে নাই বোধ হয়! তবে চেষ্টা করিলে দু একটী কবিতা ভাল হতে পারে, কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করা ভাল নয়। লাইন মিলাইলেই পদ্য হয়না—চেষ্টা করিলেই কবি হয় না।

ধাঁধা।৹

গতবারের প্রশ্ন গুলির উত্তর।

১। বিষ্কূট।, ২। লবঙ্গ+(স্রো)লতা=লবঙ্গলতা।

নূতন।

১। নিম্নলিখিত বাক্য গুলিতে যে যে পাখীর নাম লুকাইয়া আছে তাহা বাহির কর—

(ক) অভিমন্যু রণসাজে মাগিছে বিদায—
দেখিয়া উত্তরা বালা করে হায় হায!
কেঁদে বলে "রণে যদি যাবে বীরবর!
মোর গতি কি হইবে, কত অতঃপর।"

(খ) গতি নাই, দীন হীন, পড়িলাম পায।
রাখ যদি, বাঁচি তবে, নহে প্রাণ যায।

২। এক জন গোপালক খাল ছেড়ে বনের পাশে গেল, অমনি সে একটা রাক্ষস হয়ে গেল; বলতো কেমন ক'রে?

৩। আমার নাম শুনিলে ভয় হয়, অথচ আমি ধার্ম্মিক বলিয়া অমর হইয়াছি; আমি রাক্ষস, অথচ কাহারও হিংসা করি নাই, অনেক দিন হ'ল আমি এক জন ধার্ম্মিক লোককে সাহায্য ক'রে আমার ভাইয়ের সিংহাসন পেয়েছিলাম,—বলতো কে আমি?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। আগষ্ট, ১৮৮৪। ৮ম সংখ্যা।

আর একটী দুঃখের খবর।

আমাদের দেশের কপাল বড়ই মন্দ। এই সেদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দেশকে আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন। তার পরই এবার আমরা মৃত মহাত্মা শ্যামাচরণ বিশ্বাসের জীবনী দিলাম। আবার এরই মধ্যে দেশের মুখ-উজ্জ্বল আর একজন মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন। দেশের অধিকাংশ বড়লোক এইরূপে মরিয়া যাইতেছেন। বালকগণ! তোমরা এইবেলা ঐ সকল বড়লোকের স্থান অধিকার করিতে যত্ন কর। দৃঢ় ইচ্ছা থাকিলে ও যত্ন করিলে ঈশ্বর সহায় হইবেন। মৃত মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের জীবনের কথা আমরা আগামী বারের সখায় লিখিব।

ঐতিহাসিক গল্প।

তৃতীয় গল্প।

কিছুদিন যোগীন বাবু নানা কারণে তাঁহার গল্প বলিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে পুনরায় ভ্রাতা ভগিনী সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে যোগীন বাবু বলিতে লাগিলেনঃ—

"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভাল ইতিহাস রাখিয়া যান নাই বলিয়া আমরা এদেশের অতি পুরাতন কথা বেশী জানি না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপরাপর দেশের লোক, কেহ বা হিন্দু রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে, আর কেহ বা কেবল বেড়াইবার জন্য এদেশে আসিতেন। তাঁহাদের দেশের ইতিহাসে ও তাঁহাদের লিখিত বইয়ে, ভারতের পুরাতন কথা কতকটা জানিতে পারা যায়। তার পর, আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস না থাকিলেও আর আর যে সকল সংস্কৃত কবিতা পুস্তক ও অপরাপর পুস্তক আছে তাহা হইতেও কতকটা এদেশের পুরাতন অবস্থা জানিতে পারা যায়। অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সকল পুস্তক হইতে ও ভিন্ন জাতির ইতিহাসে ও ভিন্ন দেশবাসী ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের যে সকল কথা লিখিত আছে তাহা হইতে পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন, যে দুই তিন হাজার বৎসর আগে এই দেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি সভ্য ছিল। এদেশের অনেক ধন ছিল। এদেশের লোকেরা খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহারা দেশবিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এবং বিদেশ হইতে অনেক লোক এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিত। তখন চাষ করা হিন্দুদিগের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহাদের আপন জাতীয় রাজকর্ম্মচারী

তখন দেশ শাসন করিতেন। তখন হিন্দু রাজার রাজত্বে হিন্দুগণ বাস করিতেন। তখন তাঁহারা বহুমূল্য পোষাক ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের গরু, গাড়ী, ঘোড়া, উট, সকলই ছিল। যে সহরে রাজার বাড়ী থাকিত, তাহার চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত। এই সকল বিবরণ পড়িয়া জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নিতান্ত অসভ্য ছিল, তখনও আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা জগতে অতি সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এই দেশে চিরদিনই বড় বেশী ফসল হইত। নানাপ্রকার বহুমূল্য ধাতু এদেশে জন্মাইত; এবং এই দেশের লোকেরা আগে বড় ধনী ছিল। ইহাঁদের ধনের লোভে নিকটবর্ত্তী রাজাগণ প্রায়ই সুযোগ পাইলে ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের উপর অশেষ উৎপাৎ করিতেন। তখন ভারতবর্ষ নাকি আবার একটা অতি বড় নামজাদা দেশ ছিল, তাই যখন যে দেশে কোনও বড় সাহসী রাজা জন্মিতেন, তিনিই ভারতবর্ষ জয় করিয়া আপনার ক্ষমতা জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে মধ্যে মধ্যে অনেক বিদেশী রাজা আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন। ভারতের নাকি সম্পূর্ণ ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই এই সমুদায় আক্রমণের বিবরণও সবটা জানা নাই। কেবল মাত্র অতি প্রসিদ্ধ যে দুই তিনটা আক্রমণের বিবরণ অপর দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় তাই আমরা জানি।"

"আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর গত হইল পারস্য দেশের রাজা দারায়াস্ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে তাঁহার ঘোর যুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুরা হারিয়া যান। দারায়াস্ তখন সিন্ধুনদের তীরে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর হাতে ইহার শাসনের ভার দিয়া দেশে চলিয়া যান। কিন্তু দারায়াস্ ভারতবর্ষ জয় করিবার উদ্দেশে আসিয়াও সমুদায় দেশ জয় করিতে পারেন নাই, যাহা সামান্য একটু জয় করিয়াছিলেন, তাহাও ক্রমে তাঁহার হাত ছাড়া হইয়া যায়।

ইহার পর আজ প্রায় দুই হাজার তিন শত বৎসর হইল, আর একজন খুব বড় বিদেশী রাজা ভারতবর্ষ জয় করিতে আসেন। ইউরোপে মাস দেন নামে একটা দেশ ছিল,—ইনি সেই দেশের রাজা। ইহাঁর নাম সেকেন্দর। সেকেন্দর খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার মত যোদ্ধা সেই সময়ে এই পৃথিবীতে আর কেহ ছিলেন না, এই কথা তাঁহার দেশের ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকও তিনি অতি বীরপুরুষ ছিলেন। সমুদায় পৃথিবী জয় করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হয়। তিনি বহু সংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া দেশবিদেশ জয় করিতে বাহির হন, এবং তখনকার অনেক দেশ জয়ও করেন। সেকেন্দর ক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়া ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন পঞ্জাব দেশে পুরু নামে রাজা ছিলেন। পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী যে সকল দেশ ছিল, তাহার হিন্দু রাজাগণ পুরু রাজাকে সাহায্য করিতে যান। সেকেন্দরের সঙ্গে হিন্দু রাজাগণের ঘোর যুদ্ধ হয়। অবশেষে অতি কষ্টে সেকেন্দর হিন্দুদিগকে পরাজয় করেন। কিন্তু পুরু রাজার সাহস, বিক্রম, ও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া সেকেন্দর বড়ই আশ্চর্য্য হন। পুরুরাজকে জয় করিয়া সেকেন্দর ভারতবর্ষের অপরাপর রাজাগণকে জয় করিবার জন্য দেশের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহার সৈন্য-সামন্ত বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সাধ তাঁহাদিগের মিটিয়াছিল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিল না। সেকেন্দরশাহা অগত্যা দেশে ফিরিয়া চলিলেন।"

এই বলিয়া যোগীন বাবু সেদিনকার মত ভাই ভগিনীদিগকে বিদায় দিলেন।

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস)।

ই যাঁহার ছবি দেখিতেছ, উনি আমাদের দেশের একজন ভাল লোক, সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। নিতান্ত গরিব অবস্থাতে জন্মিয়া নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও চরিত্রের গুণে এ জগতে যত লোক বড় হইয়া গিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

অনুমান ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১১ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার পিতার কাল হয়; তখন ইঁহাদের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, এসংসারে গরিব বিধবার সন্তানকে কত কষ্টে মানুষ হইতে হয় তাহা সকলেই জানেন। শ্যামাচরণকেও সেই কষ্টে মানুষ হইতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহার জননী ইঁহাকে ও ইঁহার ছোট ভাইকে লইয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গায় একখানি অতি সামান্য বাটীতে অতিকষ্টে বাস করিতেন। মায়ের মনে এমন আশা ছিল না যে পুত্র দুইটীকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিবেন। বিধবার সন্তানের প্রতি কে দয়া করিবে, কে দুঃখী বলিয়া চাহিয়া দেখিবে? এ সময়ে তাঁহাদিগের দিন চলা ভার ছিল, এমন কি এই সময়ের উল্লেখ করিয়া মৃত শ্যামবাবু তাঁহার সন্তানদিগকে সর্ব্বদা বলিতেন, "বাপু তোরা ত রাজার হালে মানুষ হইতেছিস, আমার বালককালে খ্যাংরাকাটি দিয়া ছেঁড়া কাপড় শেলাই করিয়া পরিয়াছি।" এই কষ্টে তাঁহার মা তাহাদের দুই ভাইকে লইয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া একটী সদুপায় করিয়া দিলেন। বঙ্গদেশের পরম বন্ধু চিরস্মরণীয় হেয়ার সাহেব সেই সময়ে তাঁহার স্কুল খুলিলেন, এবং কলিকাতায় পথে পথে যে সব বালক ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং আলস্যে দিন কাটাইত তাহাদিগকে ধরিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামাচরণের মাতা তাঁহাকে এই স্কুলে পাঠাইলেন। শ্যামাচরণ অতিশয় বুদ্ধিমান ও মনোযোগী ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল ছেলে বলিয়া সুখ্যাতি পাইলেন। তাঁহার উপর হেয়ার সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। এরূপ শুনা যায় যে হেয়ার সাহেব তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে কেবল শিক্ষা দিতেন না কিন্তু তাঁহাকে আরও অনেক রকমে সাহায্য করিতেন, অতি নিকট সম্পর্কীয় লোকের মত সর্ব্বদা তাঁহাদের পরিবারের বিষয় খবর লইতেন এবং তাঁহার জ্বর কি অন্য কোন অসুখ হইলে, সেই সামান্য কুটীরে গিয়া দেখিতেন ও চিকিৎসা করাইতেন।

এইরূপে শ্যামাচরণ লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন।

সচরাচর বিধবার সন্তানদিগকে দেখিবার কেহ থাকে না, সুতরাং তাহারা কুসঙ্গীদের সঙ্গে পড়িয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শ্যামাচরণ অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, যেই তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল অমনি তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার উপর হতভাগিনী মায়ের আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে, তিনি বিপথে গেলে আর রক্ষা নাই। এই সময় হইতে তিনি সর্ব্বদা সুপথে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা বড় ভয়ানক ছিল। বিশেষ কলিকাতায় আরো। তখন একটী বালকের ভাল পথে চলা কঠিন ছিল। এখন যত প্রকার সুশিক্ষা ও সদুপদেশের উপায় হইয়াছে, তাহার কিছুই ছিল না। কলিকাতার বালকেরা মাথায় চাদর বাঁধিয়া কেবল যাত্রা, কবি, হাপ্-আকড়াই শুনিয়া বেড়াইত। মদ প্রভৃতি কোন একটা নেশা করিত না এমন বালক অল্প ছিল। কুসঙ্গ কুদৃষ্টান্তের অপ্রতুল ছিল না। শ্যামাচরণ আপনার প্রতিজ্ঞায় এই সকল কুদৃষ্টান্তের মধ্যেও ভাল থাকিলেন। তাঁহাকে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারিল না। অনেক লোক এক কালে খারাপ থাকিয়া পরে ভাল হইয়াছেন, কিন্তু শ্যামাচরণের নামে কখনও কোন প্রকার কলঙ্ক শোনা যায় নাই।

এইরূপে পরিশ্রম ও সচ্চরিত্রতার গুণে শ্যামাচরণ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেছেন এমন সময়ে একটী আপীসের কর্ত্তা কেরাণীগিরি কাজ করিবার জন্য হেয়ার সাহেবের নিকট একটী বুদ্ধিমান বালক চাহিলেন। হেয়ার সাহেব শাম্যাচরণকে পাঠাইলেন। শ্যামাচরণ প্রথম ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম পাইলেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের সাংসারিক খরচের উন্নতি আরম্ভ হইল। তাঁহাকে যখন যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইত তখন তাহা এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন যে তাঁহার প্রতি আপীসের কর্ত্তাদের শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ৪০৲ চল্লিশ টাকাতে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া ১০০০৲ এক হাজার টাকা মাসিক বেতন পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার এত দূর দক্ষতা ছিল যে তিনি বড় বড় ইংরাজ কর্ত্তাদের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কাজ করা তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইযাছিল। এমন কি, ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় একবার ভারতবর্ষের রাজস্বের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটী বসে, তাহাতে এই প্রকাশ পাইল যে শ্যামাচরণকে লইয়া যাইতে না পারিলে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে না; তদনুসারে উক্ত কমিটী শ্যামাচরণকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নানা কারণে যাইতে পারিলেন না।

ক্রমে অনেক বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া অবশেষে তিনি পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ভাল করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে আবার ১০০০৲ এক হাজার টাকার বেতনের একটী কর্ম্ম লইতে হইল। এই সময়ে তিনি সর্ব্বসমেত ১৫০০৲ পনর শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়াও সুখে বিশ্রাম করিতে পারিলেন না তাহা পাঠকদিগকে বলা আবশ্যক হইতেছে। এইটী দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয় কত বড় দরের লোক ছিলেন, তাঁহার হৃদয় কত উদার ও মহৎ ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ঐ ভ্রাতা একটী সওদাগরের আপীসে বড় কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়

বাণিজ্যে অনেক টাকা লাগাইযাছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওযাতে তাঁহাব অনেক হাজাব টাকা ঋণ হয়। তাঁহাব ভ্রাতা আপনাকে ধার শোধ দিতে অক্ষম জানাইযা আদালত হইতে ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি পান। ইহাব পব লোকেব আর ঋণ আদায় করিবাব উপায় ছিল না, কিন্তু শ্যামাচবণ বিশ্বাস মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভ্রাতাব সমস্ত ঋণ নিজ মস্তকে লইয়া ক্রমে ক্রমে শোধ কবিবাব ভাব লইলেন। তিনি ২৫।৩০ বৎসব ধবিযা এই ঋণ শোধ কবিযাছিলেন। এই কাবণে তিনি এত উপার্জ্জন কবিয়াও নিজেব বাড়ীটীতে বালি ধবাইতে পাবিলেন না, এই কাবণেই বৃদ্ধবযসে পেন্সন পাইযাও তাহাকে আবাব কর্ম্ম কবিতে হইল। ইহা ভিন্ন তিনি গোপনে অনেক পবোপকাব কবিতেন। তাহাব স্বভাবই এমনি ছিল যে তাহাব কোন বিষযেব প্রকাশ ছিল না। ইংবাজীতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল, অসাধাবণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল, দুই হস্তে পবোপকাব করা ছিল, কিন্তু জগতের লোক তাহা জানিতে পাবিত না। যাঁহাবা তাহাব সহিত মিশিতেন এবং বিশেষ ভাবে পবিচিত হইতেন, তাহাবাই জানিতে পাবিতেন। এ সংসাবে পবের জন্য যাঁহাবা কষ্ট পান তাহাবাই সাধু। শ্যামাচরণ বাবু সেই দরেব লোক ছিলেন।

তিনি যে চল্লিশ টাকা বেতন হইতে পনরুশত টাকা পয্যন্ত উঠিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি বড নন; এজন্য আমবা তাঁহাব প্রশংসা করিতেছি না, কিন্তু যে পরিশ্রম, যে সৎপ্রতিজ্ঞা, ও যে ধর্ম্মভীরুতার গুণে তিনি এত দরিদ্রাবস্থায় জন্মিয়াও এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এতপ্রকার কুদৃষ্টান্তের মধ্যেও আপনাকে সৎপথে রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমরা তাহাবই প্রশংসা করিতেছি। তিনি যতকাল বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে সর্ব্বদাই কলিকাতা সহরের বিখ্যাত পণ্ডিত লোকদিগেব সমাগম হইত। ইনি সকল প্রকাব সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল দলেব লোক ইহাঁব পবামর্শ গ্রহণ কবিতেন। ইনি যাহাকে অর্থেব দ্বাবা সাহায্য করিতে না পারিতেন সৎপরামর্শ দ্বাবা উপকাব কবিতেন। এইরূপে ইহাঁর জীবন পবোপকাবেই কাটিযা গিযাছে। আজ সমুদায় বাঙ্গালাব লোক ইহাঁব জন্য শোক কবিতেছে।

কোন জীবকে ক্লেশ দিওনা।

ও গাছতলায় অত লোকেব ভীড় কেন? এত গোলমালই বা কিসেব জন্য?—ঐ যে দেবন ছুটে আসছে? "কি হোযেছে দেবন?" দেবন:—"আব কি হবে? গুণধব ছেলে পাখীব ছানা ধর্ত্তে গিযে নিজে ধবা পড়েছেন? আমাদেব নগেন গাছ থেকে পড়িয়া হাত পা ভেঙ্গে বসেছেন, আব কি।" ছুটিযা গিযা দেখি যে নগেন চিৎ হইযা পড়িযা বহিযাছে, চক্ষু বুজান, বুক ধুক্ ধুক্ কচ্ছে, মুখে জল দেওযা হচ্ছে। প্রায ৫০ জন লোক চারিধাবে ঘিবিয়া "হায় হায়" কবিতেছে। ডাক্তাব আসিলেন, আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা কবিয়া গেলেন,—আশা বড় কম।

ও আবাব কি? চীৎকাব করিযা কাঁদিতে কাঁদিতে আলুথালু কেশে, কে ও স্ত্রীলোকটী ছুটিযা আসিতেছে? আহা! এই হতভাগিনী নগেনেব জননী। মা আসিযা যেই মৃতপ্রায় পুত্রেব শরীর দেখিলেন অমনি মূর্চ্ছিতা হইযা মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহাব প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাকে চেতন কবিবার জন্য সকলে ধাবমান হইল। এসব কি ব্যাপাব? কিসের জন্য এত কাও? নগেন কি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে? সে কি তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে গিয়া আঘাত পাই-

যাছে? সে কি গরিবের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজের প্রাণকে হারাইতে বসিয়াছে? তাহা হইলেত বুঝিতাম যে মরণ সার্থক, তাহা হইলে এত দুঃখ হইত না। তা ত নয়, সে যে নিরীহ পক্ষীর ছানাদিগকে ধরিয়া বৃথা কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। সে যে দুঃখিনী পক্ষিনীর স্নেহের ধন ছানাগুলিকে ডাকাতী করিয়া আনিবার জন্য গাছে উঠিয়াছিল। সে যে জননীর কোল শূন্য করিয়া জননীর নয়নতারা বাছা ধন চুরী করিতে গিয়াছিল। তাই আজ তাহার জননী নিজ হৃদয়ের ধন নগেনকে হারাইতে বসিয়াছেন। তাই আজ তাহার স্নেহের ধন পুত্রটীকে চিরদিনের তরে বিসর্জ্জন দিতেছেন। অন্যায় করিয়া কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে গেলে প্রায় আপনারই সেই দশা উপস্থিত হয়। আহা! একটা কি? কত শতটা পক্ষীর বাসাই যে নগেন ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এত গুলি পক্ষীর হাহাকার রবে, এতগুলি নিরীহ জীবের যাতনায়, এতগুলি জননীর অভিশাপে, এতগুলি দীন হীন অসহায় পক্ষী শাবকের মৃত্যু সময়ের রোদনধ্বনি ঈশ্বরের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাই, সেই মহাপাপের শাস্তি এতদিনের পর হইতেছে। ছি! ছি!! নগেনের আর দিবসে অন্য কর্ম্ম ছিলনা, কেবল টো টো করিয়া ঘুরিয়া পক্ষীর বাসা খুঁজিত। হৃদয়ে এক তিলও দয়া হইত না।

অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় নগেনের এ যাত্রা প্রাণ গেলনা কিন্তু একটী হাত ও একখানি পা চিরকাল ভাঙ্গিয়া রহিল। বেশ শিক্ষা পাইয়া বাছাধন এখন এমনি শান্ত হইয়াছেন যে যেন আর সে নগেন নাই। এখন যেখানে দেখে কোন বালক বা বালিকা কোন জীবকে ক্লেশ দিতেছে, যেখানে দেখে কোন লোক পুষিবার জন্য পাখী লইয়া যাইতেছে, যেখানে দেখে কেহ পক্ষী পুষিতেছে, সেইখানে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া উপস্থিত হইয়া আপনার হাত ও পায়ের গল্প করে ও সকলকে ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে থামাইতে চেষ্টা পায়। সর্ব্বদাই বলে ঃ—"আমাদের যেমন প্রাণ আছে, পশু পক্ষীদেরও ঠিক তেমনি আছে; আমরা যেমন কষ্ট হইলে কাঁদি ও যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও তেমনি করে, আমাদিগকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সমস্ত জন্তুকেই তিনি সৃজন করিয়াছেন ও নিয়ত আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগকেও প্রতিপালন করিতেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর যাহাদিগকে মা হইয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, আমি কে—যে সেই বেচারা পক্ষী বা পশু শাবকদিগকে কষ্ট দিই?" নিজের গত জীবনের নিষ্ঠুরতা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে ও বলে "হায়! হায়! কত যে বৃথা নিষ্ঠুরতা করিয়া জীব সকলকে ক্লেশ দিয়াছি। অনর্থক কত যে পাখীর প্রাণে যাতনা দিয়া বিনাশ করিয়াছি, তাহা বলা যায় না! এখন সমস্ত জীবন পশু পক্ষীদের কষ্ট দূর করিবার জন্য উৎসর্গ করিলেও এ পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবেনা। যাহা হউক আমি যত দিন বাঁচিব, অসহায় পশু পক্ষী ও সমস্ত জীবের যাহাতে দুঃখের নাশ হয় তাহা করিব।" এইরূপে অতিশয় কাতর হইয়া দুঃখ করে ও রোদন করিতে থাকে। প্রতিদিন আহারের পর নিজ অন্নের প্রায় সমান ভাগ পশু পক্ষীদের জন্য রাখিয়া তাহাদিগকে স্বহস্তে আহার করায়। আহা! প্রাতঃকালে যখন তাহার খাবারের টুকরাগুলি পাইবার জন্য ৫০। ৬০ টী কাক ও শালিক প্রভৃতি পাখী জমা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে;—যেই নগেন বাহির হয়, অমনি সকলে মহা আনন্দে কলরব করিয়া যখন উড়িয়া তাহার নিকটে আসে, ও তাহার নিকট হইতে টুকরাগুলি তুলিয়া লইয়া আহ্লাদে আহার করে, তখন তাহা দেখিলে কতই না সুখ হয়! যখন বাড়ীর ছাগ ও বাছুরগুলির গলা ধরিয়া "যাদু, ধন, বাছা" প্রভৃতি কথা

বলিয়া আদর করে, যখন সে পথে ঘাটে সর্ব্ব স্থানে পশুপক্ষীদিগের দিকে চাহিয়া যত্ন করে, যেন সে তাহাদের কথা বুঝিতে পারে,—তখন যাঁহারা দেখে তাহাদের মনে বড় আশ্চর্য্য ভাব হয়।

মহা দুরন্ত দস্যু রত্নাকর কিরূপে পরম যোগী ঋষি বাল্মীকি হইয়াছিল তাহা তোমরা "সখাতে"ই পড়িয়াছ। এই আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলে, সেই নিষ্ঠুর নগেন এখন প্রাণপণে পক্ষী ও পশু-দিগের কষ্ট দূর করিতে ব্যস্ত। বাস্তবিক সে যে সকল কথা বলে তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যথার্থই অবলা জীবদিগকে ক্লেশ দেওয়া মহাপাপ। আমরা ভরসা করি আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ এরূপ নিষ্ঠুর নাই, যদি কেহও থাকেন তবে যেন নগেনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিক্ষা পান। আমরা শুনিলে পরম আনন্দিত হইব যে একটী পাঠকও তাঁহার নিষ্ঠুর অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

তৃতীয় অধ্যায়।

রাস্তার উপরে একটী বাড়ীতে এক-জন স্ত্রীলোক; তাঁহার স্বামীর হাতে একটী কাগজে কিসের ছবি আছে, তাই দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ যায়গাটার নাম কি?"

স্বামী।—ইটের ঢক্।

স্ত্রী।—এ যায়গাটার অবস্থা কেমন?

স্বামী।—বড় খারাপ। আমার ভগিনীপতি বল্‌লেন, এ যায়গাটাতে বাস্তবিকই কিছু কাজ করা যায়। কিন্তু এখানকার লোকেরা এমন খারাপ, যে আমাদের উপদেশের কথা শুনিলে হয়। তিনি আরও বল্‌ছিলেন, ভগবানের দয়ায় একটা ভাল কাজ করবার যায়গা পেলাম।

উপরে যে স্বামী স্ত্রীর কথা বলিলাম, তাঁহারা পরোপকার করিবার জন্যই এই গরিবদের মধ্যে আসিয়াছেন। কাহারও কাহারও প্রকৃতিই এমন থাকে যে, তাঁহারা পরের উপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ললিতমোহন বাবু এবং তাঁহার গুণবতী স্ত্রী কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা বলিবার প্রযোজন নাই, তবে পরোপকার নামে যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, ললিত বাবু স্ত্রীর সহিত সেই ধর্ম্মকে প্রাণে ধরিয়াছিলেন।

এই গ্রামে আসিয়া ললিত বাবু প্রায়ই রামদাসের কাছে যান। তাঁর কাছে অজা মেনার কথা প্রায়ই শোনেন। তাঁর যত্নে, তাঁরই চেষ্টায়, মেনার পিতা মদ ত্যাগ করিয়াছেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেন না, তাই আজ মৃণালিণীর বড় আহ্লাদ। ক্ষুদ্র বালিকার আহ্লাদ দেখে কে! আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, ছোট মুখখানি রাঙ্গা করিয়া প্রিয়সখা অজাকে সুখের সংবাদ দিতে আসিতেছে। পথে অজাকে দেখিতে পাইয়াই মেনা বলিয়া উঠিল— "ও ভাই! শুনেছ কি, কি হয়েছে? বাবা মদ ছেড়েছেন, আর মদ ছোঁবেন না। আমাদের এত আহ্লাদ হয়েছে, যে মা আর আমি সমস্ত রাত কেঁদেছি"—এই বলিতে বলিতে তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অজা।—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? আহ্লাদ হলে কি মানুষ কাঁদে?

মেনা।—ওকি? তুমিও বোধ হয় বেশী আহ্লাদ হ'লে না কেঁদে থাকৃতে পার না। কি করব, কান্না যে আপনি এসে পড়ে! চল, ভাই! রামদাসকে বলিগে, সে শুন্‌লে হয়তো কত সুখী হবে।

ইহার পর তাহারা দুজনে আস্তে আস্তে রামদাসের ঘরের দরজায় উপস্থিত হইল। তাদের দেখিয়াই রামদাস বলিয়া উঠিল—"কি মা মিনু! ভাল খবর দিতে এসেছ বুঝি—এই বুড়োকে?

আমি আগেই শুনেছি তোমার বাপ মদ ছেড়েছেন। আমার শুনে যে আহ্লাদ হয়েছে, তা আমি আর বলতে পারি না।

এই সময়ে ললিত বাবু রামদাসের ঘরে বসেছিলেন, তাকে দেখে অজা ও মেনা লুকাবার চেষ্টা করিল। তিনি তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এসো মা! এসো, এসো বাবা! এসো,—ভয় কিসের? এসো আমার কাছে এসো।"—এই বলিয়া তাদের নিকটে আসিয়া দুজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের নাম কি?"

তাহারা আপন আপন নাম বলিল।

ললিতবাবু।—তোমাদের দুজনে বুঝি বড় ভাব?

রামদাস।—একেবারে গলায় গলায়। যেখানে অজা সেইস্থানেই মেনা।

ললিতবাবু।—তোমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?

মেনা।—আমি এক বছরের বড়।

ললিতবাবু।—তুমি মা প'ড়তে পার?

মেনা।—হাঁ, মা আমাকে রোজ পড়ান। আমি চারুপাঠ পড়ি।

ললিতবাবু।—তুমি বাবা কি বই পড়?

অজা।—আমি ক, খ, পড়ি। মেনা আমায় পড়ায়।

ললিতবাবু।—বেশ! খুব ভাল ক'রে প'ড়বে। ভাল হবার জন্য খুব চেষ্টা ক'রবে, তাহ'লে তোমাদের সকলেই ভালবা'সবে।—মেনা! তোমার বাবার নাম কি?

মেনা বলিল—"আমার বাবার নাম বিনোদবিহারী বসু।"

ললিতবাবু।—ওঃ! বটে? তুমি বিনোদবাবুর মেয়ে? তোমার বাপকে বলতে হ'চ্ছে তোমরা দুজনে রবিবার এক যায়গায় যাবে। তোমার বাপকে বল্লেই তিনি তোমাকে পাঠাবেন; অজার কথা তার ঠাকুরমাকে বল্লেই হবে।

ইহার পর ললিতবাবু অজার ঠাকুরমা ও মেনার বাবাকে বলিয়া অজা মেনার যাবার অনুমতি লইলেন। আজ রবিবার, অজা মেনা ললিতবাবুদের বাড়ীতে বালক বালিকাদিগের সম্মিলনে গিয়াছে। এই সম্মিলনে ললিতবাবুর স্ত্রী সুরমা দেবী বালক বালিকাদের উপদেশ দেন, গল্প বলেন, ছবি দেখান, তাদের নিয়ে খেলা করেন; এই জন্য ছেলেরা সকলে তাঁকে ভালবাসে। সুরমা দেবী অজা মেনাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। অজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" অজা চমকিয়া উঠিয়া বলিল "এঁ্যা, আমার নাম অজা।"

সুরমাদেবী।—এতো ডাক্ নাম। তোমার আসল নাম কি?

অজা।—তা জানি না। আমার আর নাম নাই।

সুরমা।—নাম আছে বই কি? দেখি কে এর নাম ব'লতে পারে?

কেহই অজার যথার্থ নাম বলিতে পারিল না। তখন সুরমাদেবী কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিলেন "যাঃ—আজ আমি তোমাকে কার্ড (নাম লেখা রং করা মোটা কাগজ) দিতে পার্‌ছি না দেখ্‌ছি। তোমার নামটী আগে জান্‌তে হবে!"

এই কথা শুনিয়া অজা কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না দেখিয়া সুরমা দেবী তাহার চোখের জল মুছাইয়া বলিলেন "কেঁদ না, ধন! আস্‌ছে রবিবারে তোমায় একখানা দিব। তাতে দুঃখ কি? কেঁদনা, চুপ কর।"

বাড়ী যাবার সময় অজা কাঁদিতে কাঁদিতে মেনাকে বলিল "মেনা! সকলেই কার্ড পেলে, আমি পেলাম না, আমার মা নাই, আর এখন আবার নামও নাই।" মেনা পণ্ডিতের মত বুঝাইয়া বলিল—"তাতে আর দুঃখ কি? তোমার মা তো স্বর্গে আছেন? তোমার নামও অবিশ্যি কোথাও না কোথাও আছে"—পরে হঠাৎ কি মনে হওয়াতে

বলিয়া উঠিল—"লোকে বলে ঈশ্বরের কাছে নাম লেখা থাকে। তা হলেই তো তোমার নাম ঈশ্বর জানেন। এই তো মিট্‌মাট্। আর কাঁদ কেন? তোমার মা স্বর্গে, তোমার নামও স্বর্গে লেখা আছে।"

মেনার মুখে এই কথা শুনিয়া অন্ধা প্রফুল্ল হইল। মনে মনে বলিল—"তবে আর কি? আমার মাও আছেন, আমার নামও আছে! এই-বারে তাঁকে ব'লব, আমার নাম স্বর্গে আছে, তা হ'লে একখানা কার্ড পাব।"

কিন্তু আজ অনেকদিন তারা কেউ ললিতবাবুর বাড়ীতে যায় নাই, কাজেই নামের কথাও বলা হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

ললিত বাবু আহার করিতেছেন, এমন সময় চাকর একখানা চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্রখানি পড়িয়া সুরমা দেবীর হাতে দিয়া বলিলেন,—"পড়িয়া দেখ, দেখে একটা কিছু ঠিক কর।"—সুরমা দেবী পড়িতে লাগিলেন—

"শ্রীচরণেষু,——দাদা! আমরা এখানে আসিয়া বেশ ভাল আছি। আমরা বেশ কাজ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের কিছুরই অভাব নাই। বড় বাড়ী, ঘর দোর, পড়ে আছে; একটী ছোট ছেলে বেশ থাকিতে পারে, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু ভগবান আমাদের সন্তান দেন নাই। বাড়ী, ঘর দোর আছে, কিন্তু ছোট ছেলের অভাব। তাই দাদা! আমার বড় ইচ্ছা যে তোমাদের ওগ্রামের মধ্যে যে ছেলেটী বা মেয়েটীর অবস্থা বড় খারাপ এমন একটী ছেলে কি মেয়েকে পালন করি। দাদা! একটী ছেলে কি মেয়ে যাহা পাও, খুঁজিয়া আমাদের এখানে নিয়ে এসো। আর অধিক কি লিখিব। বৌদিদীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিও। তোমরা কেমন আছ?

তোমার স্নেহের ইন্দু।"

সুরমা দেবী পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল? অন্ধাকে দিলে হয় না? আমার তো ইচ্ছা তাকেই দাও।"

ললিত বাবু—সে যে খোঁড়া। তার শরীর বড় খারাপ।

সুরমা—ইন্দুতো তাই চায়। আহা! সে বড় কষ্ট পায়! এমন ছেলেকে যদি দয়া না কর তবে দয়ার পাত্র কে?

ললিত বাবু—হ্যাঁ, ছেলেটী বড় ভাল। রাম-দাস তার বড় সুখ্যাতি করে। অন্ধার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিব, সে যদি দিতে চায়।

এইরূপ কথাবার্ত্তার কিছু দিন পরে ললিত বাবু অন্ধার ঠাকুরমার কাছে অন্ধাকে দিবার কথা বলিলেন। তাহাতে সে উত্তর করিল—"ছেলেটাকে বিদায় কর্‌তে পার্‌লেই বাঁচি। কিছু টাকা দিলেই দি?"

ললিত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "অন্ধার আসল নাম কি?" অন্ধার ঠাকুরমা এই কথা শুনিয়া একেবারে চটিয়া উঠিয়া বলিল "তোমার ওর নামে দরকার কি? নাম অন্ধা! যদি এ নাম পছন্দ না হয়, তোমাদের যা ইচ্ছা সেই নাম দিও।" এই সকল কথা শুনিয়া সুরমা দেবী বলিলেন,—"তবে আর কি হবে? না হয় কিছু টাকা দিও। এতদিন খেতে প'রতে দিলে, তা টাকা নিতে পারে। গরিব মানুষ, কোথায় পাবে?" ললিত বাবু টাকা দিতে সম্মত হইলেন, অন্ধার ঠাকুর মা চল্লিশ টাকা পাইয়া তাহাকে বিদায় দিল।

আজ ললিত বাবু অন্ধাকে আনিতে গিয়াছেন। অন্ধা আজ কাঁদিতে কাঁদিতে মেনার নিকট বিদায় লইতে যাইতেছে। মেনা তাহার চক্ষে জল দেখি-য়াই ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল ও গলা জড়া-ইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! কাঁদ্‌ছ কেন?"—এই বলিয়া আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। অন্ধা আর থাকিতে পারিল না; সে খুব জোরে

কাঁদিয়া উঠিল—"ভাই! আর তোমাকে এ জন্মে দেখিব না। আজ বিদায় নিতে এসেছি; আজ আমি যাব। আর তোমায় কখনও দেখিব না।"

মেনা—"সে কি? তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর এখানে আ'সবেনা?" এই বলিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল। কিছু পরে বলিল—"যাই। রামদাসের কাছে যাই। এখনই যেতে হবে। এসো মেনা।"

মেনা মুখ খানি ভার করিয়া অজার সঙ্গে চলিল। রামদাসের ঘরের কাছে গিয়া দেখে দরজা খোলা। তাদের দেখিয়া রামদাস বলিয়া উঠিল—"বাবা! তুমি আজ না যাবে? ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন। আর বোধ হয় তোমাকে কখনও দেখিতে পাবনা। বাবা! চিরকাল সুখে থাক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ভগবানের উপরে যেন তোমার মতি হয়। এই বুড়োকে মনে রেখো।"

রামদাসের নিকট বিদায় হইয়া অজা দিদিমার নিকট বিদায় লইতে চলিল। যাইবার সময় মেনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভাই আর তুমি এখানে আ'সবেনা? আর তোমায় দে'খতে পাবনা? তুমি সেখানে গেলে আমায় ভুলে যাবে? আমায় ভুলো না; আমি তোমায় কখনও ভু'লব না। তুমি গেলে কার সঙ্গে খেলা ক'রব? কার সঙ্গে গল্প ক'রব? আমার আর কেউ রইল না।"

অজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল, পরে মেনার গলা জড়াইয়া চোখের জল মুছাইয়া বলিল—"ভাই! কেঁদনা। আমি তোমায় ভু'লব না। যদি তুমি আমার বোন হতে, তা হলে তোমায় কখনই ছেড়ে যেতাম না। তোমার সঙ্গে খেলা ক'রতাম। লোকের ভাই বোনে ঝগড়া হয়—তোমার সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়া হ'ত না।"

"অজা!—ভাই! যাই, দেরী হ'লে বাবা ব'ক্‌বেন। আর কখনও দেখা হবে না"—এই বলিয়াই মেনা কাঁদিয়া ফেলিল। ফের "যাই" বলিয়া অজাকে বারম্বার চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন অজা দিদিমার কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। তাহা শুনিয়া ফলওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "যাবে? কোথা যাবে? আর আ'সবেনা?"

অজা—বোধ হয় না।

ফলওয়ালী—ওমা সত্য নাকি? আহা! চল্লে? বেঁচে থাক বাবা! সুখে থাক! তুমি বড় ভাল ছেলে। এই নাও, পথে এই আম দুটো খেও। দিদিমাকে ভুলো না।

সকলের নিকট বিদায় লওয়া হইলে, ললিত বাবু অজাকে সঙ্গে করিয়া আপনার ভগ্নী ইন্দুরেখার বাড়ীতে যাত্রা করিলেন এবং পথে অনেকক্ষণ গাড়ীতে কষ্ট পাইয়া অনেক বিলম্বে সেখানে গিয়া পৌছিলেন।

ঠাকুরদাদার গল্প।
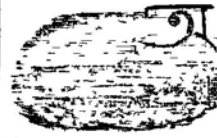
আজ অপরাহ্নে বাগানের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে নবীন বাবু সব ছেলেদের লইয়া তাহার বাঁধা ঘাটে বসিলেন। নলিনচন্দ্র মহারাজার এবার বড় আনন্দ, এবার তাঁহার একটী সম বয়স্ক বন্ধু আসিয়াছেন, নলিন ও মাখমে বড়ই ভাব। তাহারা গলা ধরাধরি করিয়া ফুল তুলিয়া পরস্পরকে সাজাইতেছে। নলিন ফুল লইয়া মাখনের কাণে, মাথায় দিতেছে। মাখন একটু সূতা পাইয়া একছড়া মালা গাঁথিয়া নলিন বাবুকে পরাইতেছে। বড় সুন্দর! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

গল্প আরম্ভ হবে শুনিয়া দুজনে ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া দাদার কোলের গোড়ায় বসিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক হইল যে আজ বাতাসের কথা বলা হবে। তখন "হু হু" করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতেছিল। তাই কিশোরী প্রথম প্রশ্ন তুলিল যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতেই

শীতকালে উত্তর দিক হইতে বাতাস বয় কেন? সকলে ঐ কথায় সায় দেওয়াতে নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন।—"এ বিষয়টী বড় কঠিন, এটী বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বুঝিতে হইবে। স্থির মনে ধীর ভাবে সকলে শুন। সে দিন বলিয়াছি, মনে আছে, যে উত্তাপ পাইলে কঠিন তরল হয়, আর পাৎলা জিনিষ বাষ্প হয়, আবার বাষ্পীয় পদার্থ আরও হাল্‌কী হইয়া যায়? (সকলেঃ—"মনে আছে") তাহা হইলে বেশ কথা। এখন গ্রীষ্ম কাল, সূর্য্য দুফুর বেলা মাথা ছাড়িয়ে খানিকটে উত্তর দিকে যায়, আর শীতকালে সূর্য্য প্রায় দক্ষিণ ধার দিয়া যায়, মাথার উপরই উঠে না। কেমন? (সকলেঃ—"ঠিক কথা।" কিশোঃ—"হাঁ দাদা, আমি ও কথাটা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম।") ওটী একটু বেশী শক্ত, এখন বুঝিতে পারিবেনা, কিন্তু মনে রাখিও গ্রীষ্মকালে সূর্য্য মাথা ছাড়িয়া উত্তরে যায়, তাহাকে "উত্তরায়ন" অর্থাৎ উত্তরে যাওয়া বলে; আর শীতকালে মাথা ছাড়িয়া দক্ষিণে যায় তাহাকে "দক্ষিণায়ন" বলে। আর এই উত্তর ও দক্ষিণ সীমার ঠিক মাঝখানে যে রেখা পৃথিবীর উপর দিয়া যায় তাহার নাম "বিষুব-রেখা।

আর একটী কথা বড় দরকারী, বুঝিতে হইবে। মনে কর একটা প্রদীপ, তাহার ঠিক সুমুকে যত তাপ পার্শ্বে তত নয়। এটা যদিও ঠিক উপমা হলনা, তবু মনে বুঝে দেখ, একটী নিয়ম আছে, কোন তপ্ত জিনিষের তাপ যখন ঠিক সোজা পড়ে তখন যত গরম লাগে, বাঁকা হইয়া পড়িলে, তত গরম লাগে না। মনে কর রোজ যখন সূর্য্য মাথার উপরে উঠে, তার তেজটা পৃথিবীতে ঠিক সোজা ভাবে পড়ে, তখনই বা গরম এত লাগে কেন, আর যখন সকালে বিকালে সূর্য্যের তাপ বাঁকা হইয়া পড়ে তখন মোটেই গরম বোধ হয়না কেন? ঐ কারণ। বুঝেছ? (সকলেঃ—"হাঁ") এর পর এ কথা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। এই নিয়মটী থাকার জন্যই শীতকালের রৌদ্র গরম বোধ হয়না, বরং আরাম বোধ হয়। আর গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে বেলা ৯টার সময়েই দাঁড়ান যায়না। এই জন্যই দুফুর বেলায় আবার সকাল বিকালের চেয়ে বেশী তাপ থাকে।

বেশ কথা। এখন অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে উত্তরায়নের সীমা হইতে বিষুবরেখার উপর দিয়া দক্ষিণায়নের সীমা পর্য্যন্ত যে ভূভাগ তাহাই সব স্থান অপেক্ষা অধিক উষ্ণ,—না? কেননা ঐ স্থান-টীতেই সূর্য্যের তেজ সোজা পড়ে। সমস্ত বছরের মধ্যে সূর্য্য একবার উত্তর হইতে বিষুবরেখা দিয়া দক্ষিণ, ও পরে দক্ষিণ হইতে বিষুবরেখা হইয়া আবার উত্তর, এই পথ টুকু চলে। কেন চলে, সে কথা এখন বুঝিতে পারিবেনা, কিন্তু চলে। পৃথিবীর মধ্যে এই সীমা দুটীর বাহিরে অন্য কোন স্থান সূর্য্যকে আর মাথার উপর পায় না। বুঝিলে? এসব বড় শক্ত কথা, একটা গোলক হলে বেশ বোঝা যায়। বাড়ী গিয়ে সকলে গোলক দেখিবে। যাহোক, এ টুকু বেশ বুঝিয়াছ যে, বিষুবরেখাতে ও তাহার নিকটস্থ স্থান সকলে সূর্য্যের তেজ বড় অধিক। আরও বুঝিলে যে গ্রীষ্মকালে "উত্তরায়ন" হয় বলিয়া উত্তর সীমা দক্ষিণ সীমা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তপ্ত হয়। আর শীতকালে "দক্ষিণায়ন" বলিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণ ভাগ উত্তর ভাগ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। কেমন? (সকলে ঃ—"এটুকু বেশই পরিষ্কার হইয়াছে।")

বেশ কথা। এখন ম্যাপে দেখিও বিষুবরেখা ভারতবর্ষের কিছু দক্ষিণে আছে। (কিশোঃ"—আমি জানি।") হাঁ বাড়ী গিয়া ম্যাপে দেখিলেই টের পাবে। যে সোজা একটা লাইনের গায়ে "০" শূন্য লেখা আছে সেইটারই নাম বিষুবরেখা। সেটা আমাদের দেশের কিছু নীচে দিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। ওদিকে সূর্য্যের উত্তরায়নের সময়

হিন্দুস্থানের উত্তরভাগ এবং তার ওপার্শ্বের তিব্বৎ, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশ সকলের উচ্চ উচ্চ মরুভূমির মত স্থান সব খুব উত্তপ্ত হয়। আমরা ভারতবর্ষের উত্তরভাগের লোক, সুতরাং এ কথা আর বেশী বুঝাইতেই হইবে না। গ্রীষ্মকালে যে আমাদের দেশ কিরূপ ভয়ানক গরম হয় তাহা ত সকলেই জান। আবার দক্ষিণ দিকে সূর্য্য না থাকায় দক্ষিণ দিকের ভারত মহাসাগর ও তাহার চারিদিকের স্থান সকল আমাদের দেশ অপেক্ষা শীতল থাকে। দেখ এটী না বুঝিলে আর কিছুই হবে না। আমি আবার বলি—গ্রীষ্মকালে উত্তরায়ণ হয় অর্থাৎ সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তর দিকে চলিয়া আসে। তাহাতে ভারতবর্ষের উত্তরভাগ ও তিব্বৎ তাতার প্রভৃতি দেশের শুষ্ক স্থান সকল ভয়ানক গরম হইয়া উঠে। কিন্তু সূর্য্যের সোজা কিরণ না পাওয়াতে দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগর ও তাহার চারিদিকের জলরাশি ঐ সব যায়গার চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে। বুঝিলে ত? অ্যাঁ? (সকলেঃ—"বেশ বুঝিয়াছি দাদা মহাশয়")।

নলিন—"আমিও বুঝিতেছি, দাদা।"

মাখন—"হ্যাঁ দাদা। আমিও।"

কিশোরী—"হ্যাঁ মাখন, বুঝিয়াছিস্? আচ্ছা বল্ দেখি বিষুবরেখা কাকে বলে?"

মাখন—হ্যাঁ তা বুঝি আমি জানি? অতো আমি ত বল্‌তে পারি না। আমি যদি অতো বুঝ্‌তুম তা হলে তোমায় দাদা বোল্‌বো কেন? হ্যাঁ দাদা? আমি কি অতো বলিতে পারি?"

গোলযোগ মিট্‌মাট্ করিয়া দিয়া নবীন বাবু আবার আরম্ভ করিলেনঃ—"তোমরা সকলেই জান, যাহা প্রথমেই বলিয়াছি যে তাপ পাইলেই বস্তুসকল আরও পাৎলা হয়, আর কাজে কাজেই পাৎলা হইলেই হাল্‌কী হয়। এ নিয়ম কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, সকল পদার্থেই খাটে। এখন যদি দুই স্থানে দুটী পাত্র বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তাপ দেওয়া যায় তবে যেটাতে বেশী তাপ দিবে সেইটা বেশী ফুলিয়া উঠিবে। আর যেটা বেশী ফুলিবে, তাহার ভিতরের বায়ু অন্যটার চেয়ে হাল্‌কী হবে। তেমনি যে দেশের বায়ু যত গরম হবে সে দেশের বায়ু তত হাল্‌কী হবে। আর যেখানকার বায়ু যত শীতল হবে সেখানকার বায়ু তত ভারী হবে। এ অতি সহজ কথা। কেননা গরম হলেই ফোলে অর্থাৎ তাহার পরমাণু সকল ফাঁক্ ফাঁক্ হইয়া যায়, কাজেই হাল্‌কী হইয়া যায়। আচ্ছা! এখন দেখি কোথায় এসেছ? ভারতবর্ষের উত্তরভাগ ও তিব্বত তাতার প্রভৃতি দেশের বায়ু গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম হয়, কাজেই উহা হাল্‌কী হয়। তার পরে কি? হাল্‌কী হলেই চারিদিকের ভারী বাতাসের উপরে উঠিবে। যেমন একটা আগুনের কুণ্ড করিলে তাহার উপরের বাতাসটা গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ধুলা, পাতা নাতা পর্য্যন্তও উঠিতে থাকে, তেমনি এখানেও ঐ সকল গরম বাতাস উপরের দিকে চলিয়া যায়, নীচেটা খালি হইয়া যায়। কিন্তু পাৎলা জিনিষের দস্তুরই হোচ্ছে যে খানিকটা তুলে নিলে চারিধার থেকে আসিয়া সে স্থানটা পূরিয়া ফেলে। এক ঘটী জল পুকুর থেকে তুলিয়া লইলে তাহার যে গর্ত্ত মতন হয়, সেটা তখনই চারিদিকের জলে আবার পূরিয়া যায়। তেমনি যেই সেই গরম হাল্‌কী বাতাস উপরে উঠে, অমনি চারিদিকের যেখানে ঠাণ্ডা ভারী বাতাস থাকে তা এসে সেই খালি যায়গা পূরে ফেলে। বুঝলেত? (সকলেঃ—"হাঁ, বেশ বুঝেছি") ভাল। এখন বল দেখি কোন্ দিক থেকে হাওয়া কোন্ দিকে যাবে? (সকলেঃ "কেন ভারী ঠাণ্ডা বাতাস দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগরে আছে, তাই যাবে উত্তর দিকে; না?") ঠিক। দক্ষিণে যে শীতল ভারী বায়ু আছে তাহাই "হু হু" করিয়া বহিয়া গিয়া উত্তর দিকের সেই ফাঁক বুজাইয়া দিবে। এখন ভাবিয়া দেখ কতোখানি যায়গা

এই রকম ফাঁক হইয়াছিল—?—এমন কি, অনেক হাজার বর্গমাইল ভূমি একেবারে বায়ুশূন্য হইত,যদি এই বায়ুর প্রবাহ দক্ষিণ দিকের সাগর হইতে না আসিত। এই জন্যই সমস্ত দিন এত জোরে দক্ষিণে হাওয়া হয়। রাত্রিতে যখন উত্তর দিকের ঐ সকল স্থানে সূর্য্য না থাকাতে উহাদের বায়ু শীতল হয়, তখন আর উহা উপরে উঠে না, এজন্য রাত্রে আর তত জোরে বায়ু দক্ষিণ দিক হইতে বহে না। কোন কোন রাত্রে মোটেই হাওয়া থাকে না তাহারও কারণ এই। যে দিন যত অধিক রৌদ্র হয়, সে দিন প্রায় তত অধিক তেজের সঙ্গে দক্ষিণে-হাওয়া হইতে দেখা যায়। আর সমুদ্রের উপর হইতে আসে বলিয়া ঐ হাওয়া বেশ শীতল হয়, সমস্ত দিনের অসহ্য গ্রীষ্ম,তার পরে সন্ধ্যার সময়ে দক্ষিণে-হাওয়া কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধ, কি হৃদয় শীতল-কর। সকলে এখন দক্ষিণে-হাওয়ার কারণ বুঝিলে? এ বিষয়টা একটু গোলমেলে, তবু বার দুই তিন মন দিয়া "সখা" পড়িলেই মনে থাকিয়া যাইবে।"

কিশোরী বলিল "আচ্ছা দাদা মশাই! শুনুন দেখি এখন আমি বলিতে পারি কি না শীতকালে উত্তর দিক হইতে বায়ু বহে কেন?—শীতকালে দক্ষিণায়ন, এজন্য সূর্য্য দক্ষিণ দিকে থাকে, কাজেই দক্ষিণ দিকের সাগরের জলটল খুব নরম হয়, উত্তর দিক তখন শীতল থাকে। এখন দক্ষিণের গরম বায়ু উপরে উঠিয়া যায় ও তাহার বহানে উত্তর হইতে শীতল ও ভারী বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়।"

খুকুর সাধ।

মাদের খুকু বড় আদরের ধন। অনেক লোক আমাদের বাড়ীতে আসেন,সকলেরই সঙ্গে তার খুব ভাব। খুকু সকলের সহিতই মহা আনন্দে মনের সুখে দিন কাটায়। তার ভাল নাম আছে,খুবই ভাল নাম, তবু কি জানি আমরা সকলে কেমন তাকে "খুকু খুকু" বলিয়া ডাকিতে ভাল বাসি। আহা! অমন মিষ্ট কথা বুঝি আর নাই! খুকুর বয়স এই সবে মাত্র তিন বছর। কিন্তু এরই মধ্যে সে এত কথা কয়, এত গল্প করে, এত আমোদ করে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। গায়ে একটুও গয়না নাই, পরে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ত বলে "ও সব সোণার গয়না আমি প'রব না, বাবা আমাকে আকাশের তারা গুলোকে পেড়ে কণ্ঠমালা কোরে দেবে, আর মা বলেছে যে খুব বড় গোল পানা যে দিন চাঁদটী উঠিবে, সেই দিন সে খানাকে ছিঁড়ে এনে আমার জন্যে বাজু গড়িয়ে দেবে!"

খুকু এমনি ভাল লোক যে বাড়ীতে কোন লোক এলে অমনি তাঁহার সঙ্গে নানা রকম কথা বার্ত্তা কহিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। বাবা আসিতে যদি দেরী থাকে তবে সে লোকের কোন কষ্টই দেয় না। যদি তিনি বলেন "আমি যাই, তোমার বাবার দেরী হচ্ছে" তবে খুকু মহা দুঃখিত হইয়া বলে "না যেতে দেবোনা। আর একটু থাকুন না বাবু! থাকুন।" এই বলিয়া হয় একটা পান, নয় একখানা সাবান কি অন্য কিছু বাড়ীর ভিতর থেকে নিয়ে ছুটে আসে আর বলে "এইবার থাকুন আর একটু বাদেই বাবা আ'সবেন।" আরও বলে "দেখুন! ঐ যে নিচু গাছটী দেখ্‌ছেন ওটা আমি পুতেছি, আর ঐ গাছটীতে নিচু হোলে আপনাকে দেবো। আর আমি আপনাদের বাড়ী যাবো, গিয়ে আপনাদের, খুকীদের বেশ কোরে আমার কাপড়, গয়না, সব পরিয়ে দিয়ে আস্‌বো। কেমন?" এইরূপ কি চমৎকার যে তাহার কথা বার্ত্তা, কি সুন্দর কি মনোহর তা আর বল্‌তে পারি না। আহা! যদি দেখবার হোতো তাহ'লে, পাঠক পাঠিকা! তোমাদের সকলকে দেখাতুম কি মেয়ে! আবার এদিকে এমনি স্মরণ শক্তি যে "সখা"র পায়রামনি প্রভৃতি অনেক পদ্য মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। সে বলে আমি বড় হ'য়ে "এ রকম গান লিখ্‌বো।"

তোমরা আশীর্ব্বাদ কর ঈশ্বর কৃপায় খুকু আমাদের বেঁচে থাকৃ ও বড়লোক হোয়ে দেশের বালক বালিকাদের উপকার করুক।

চালনি বলেন ছুঁচ ভাই তুমি কেন ছেঁদা ?

কেনারাম সম্মুখের লোকটীকে দেখাইতেছেন। তাঁর নিজের পীঠের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে হইত। নিজের দোষগুলিকে সকলেই পেছনে ফেলিয়া দিতে চায়। আমি চেঁচিয়া বলিলাম লোকনাথ বড় রাগী, আমি তাহাকে ভালবাসি না; বল দেখি ভাই, আমার সম্বন্ধে তুমি কিরূপ মনে করিতেছ? অন্যের ছেঁড়া মোজা দেখিয়া বিরক্ত হওয়ার আগে নিজের জুতার ভিতর চাহিয়া দেখা ভাল। আমি যতক্ষণ বসিয়া থাকিব, ততক্ষণ তুমি হাঁটিতেছ না বলিয়া আমার বিরক্ত হওয়ার অধিকার কি? আর যদি এমন হয় যে আমি হাঁটিতেছি, তাহাতেই বা কি হইল?

অন্যের তিলটীকে তাল করিবার পূর্ব্বে নিজের তালটী ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল। গম্ভীর ভাবে বক্তৃতা করিলে কি হয়, পরক্ষণেই যদি বক্তা নিজের অসারত্ব হাতে কলমে বুঝাইয়া দেন, তবে লাভ কি হইল?—লাভ হইল যে, অন্য কেহ ঐ বিষয় নিয়া আমাকে কিছু বলিলে, আমি তাহাকে বলিব "আরও একজন একবার বলিয়াছিলেন।" আমার দোষ দেখিয়া তোমার কষ্ট বোধ হইয়াছে?—ভাল। কিন্তু কষ্ট পাইয়া যদি তুমি আসিয়া মুরুব্বী লোকের মতন আমাকে বকিতে থাক, তবে হয়তো লাভের মধ্যে এই হবে যে তোমাতে আমাতে যে ভালবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকিবে না। ক্লাশে একটী নূতন ছেলে আসিল—বেচারাকে যেন খেলার সামগ্রী পাইলে, অত বোকা বুঝি আর কেহ কখনও দেখে নাই! কিন্তু মনে পড়ে কি? তোমাকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া ইস্কুলে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে দিয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তুমিও একটী জানোয়ারের মতন ছিলে কি না? অন্যের ত্রুটী নিয়া হাসি তামাসা করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের অনেকেরই দেখা যায় মেজাজটী বড় উগ্র—কথা সয় না। ইহাঁরা যদি অন্যের উপর ঢিল ছুড়িবার সময় নিজের গায় মারিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। না হয় প্রতিপক্ষের পাটকেলটীর সময় যেন মুখ বিকৃত না করেন। বাস্তবিক ওরূপ লোকের ঐ ঔষধ—আমি বলিলাম "থক" তুমি বলিলে "থুঃ"। বেশ সম্মানে সমানে গেল। এরূপ বার কয়েক হইলেই দেখিবে আমার রোগ সারিয়াছে, আমি ভাল মানুষ হইয়াছি।

ভাল ঠাট্টা কয়জন করিতে পারে? কথা শুনিয়া হাসিলাম; উপকারও হইল; এরূপ কথা কয়জন বলিতে পারে? প্রায়ইতো দেখি, তুমি বলিলে, আমি হাসিলাম, আর বন্ধু চটিল। আমা-

দের দেশের একজন প্রতিভাশালী লোক বলিয়াছেন—"কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ, লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।" তুমিতো এক কথা বলিয়া মজা করিলে; আমি বেচারা যে তাহাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। ঠাট্টা মাঝে মাঝে ভাল লাগে, কিন্তু বিদ্রূপকে বড় ভয় করি। যিনি স্বভাবতঃ কাহারও মনে ক্লেশ না দিয়া নির্দ্দোষ কথা বলিয়া সকলকে আমোদ দেন, তিনি বড় ভাল লোক। আর যাহাদের দোষ সংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল বিদ্রূপ করিবার জন্য অন্যের সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ছেলেবেলা পড়িয়াছি "খলেরা কেবল পরের দোষই অন্বেষণ করে"—।

রাগ।

বাবা! কি রাগ গো! বাবুর মুখের উপর রাগ হইয়াছে। তাইতো, মুখ ব্যাটার জ্বালায় বাবু এখন আর আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। অমন মুখ আবার বাবু লোকের থাকে?—তাই বাবু রাগ করিয়া মুখকে জব্দ করিবার নিমিত্ত মুখের নাকটা কাটিয়া ফেলিতেছেন, এবার মুখ একাকার হইয়া যাইবেন।

রাগ হইলে বিচার শক্তি একটু কমিয়া যায়। আমরা কোন ফকিরের কথা শুনিয়াছি। ফকিরের এক শত্রু ছিল, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিজের ছেলেকে বলিল "তুই আমাকে মারিয়া ওদের দরজায় ফেলিয়া রাখ"। ছেলে তাহাই করিল। বল দেখি জব্দ হইল কে? ছেলে বাবুদের অনেককে দেখিয়াছি, মার উপর রাগ হইয়াছে, সুতরাং সে দিনের মত আহার পরিত্যাগ করিলেন। পাকা লোক হইলে পাছে মা বিরক্ত করিতে আসেন, তাই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকেন! এই হইল মার শাস্তি। ক্ষুধা কিন্তু রাগ বোঝেনা, তাহার সময় হইলে সে হাজির হইবেই। রাগের ফল হইল ক্লেশ, ক্লেশের ফল অনুতাপ।

সকলেই মাঝে মাঝে অন্যায় করিয়া বলিয়া থাকেন, "রাগের মাথায় করিয়াছি।" বলি, রাগের মাথাটা কি?—অর্থাৎ তখন বিচারশক্তি ছিলনা। ততক্ষণ আমি পাগল, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ!! খুনটা নিজের উপর দিয়াই অনেক সময় হইয়া যায়। রাগের মাথায় যত কম কাজ করা যায় ততই ভাল। যদুর ছোট বোন তাহার ছবির বইএর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, যদু "রাগের মাথায়" তৎক্ষণাৎ বইখানাকে উনুনের ভিতর রাখিয়া আসিল! এ রোগ অনেকেরই আছে।

রাগ হইলেই অনেকে মনে করেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন, অন্যের তাতে কিছু বলিবার অধিকার নাই। রাগ হইলে অনেকে নিজেকেই কষ্ট দেন—আহা বেচারা!!

শেষে একটা কথা বলি। ভাই, রাগকে বিশ্বাস করিওনা। রাগ যখন তোমার ভিতরে আসিবেন তখন খুঁজিলে দেখিবে সে বুদ্ধিটী পলায়ন করিয়াছে। রাগ আসিয়া তোমাকে তাঁহার করিয়া লইবেন। তখন আমি গাধা, গরু, ষাঁড়, মহিষ, যা কিছু হইনা কেন, তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই।

তাই আজ বাবুর নাকের উপর চোট্!!

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্ন গুলির উত্তর।

১। (ক) মোরগ; (খ) পায়রা। ২। রাখাল। ৩। বিভীষণ।

১। পক্ষী নয় তবু দুটী পক্ষ আছে তার।
শাদা, কাল, পক্ষ দুটী অতি চমৎকার।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে কোনজন।
কোথা দিয়া চলে যায় না হয় দর্শন।

২। কাণে ধরে না চালালে সোজা কভু যায় না।
এমন বেহায়া আর কোথা আমি দেখিনা।
হাত পা নাই ক তার বুক-ভরে চলে।
বল দেখি ভাই তুমি এটাকে কি বলে?

৩। মনুমেণ্টে বাস মম আমেরিকা ঘর।
খুঁজিয়া পাবেনা কিন্তু পৃথিবী ভিতর॥

২। "থাকা ভাল কিন্তু পাওয়া মন্দ"—বল দেখি কি?

৪। "রাজার ছেলে ও কুম্ভকারে তফাৎ নাই কেন?"

৫। দেখিলে তা পায় না,
পেলে কিন্তু দেখে না,
বল দেখি কি?

৬। একটী ছেলে একটা বাটীতে ম্যাজেণ্টা ভিজাইতেছিল; সেইখানে এক জন একটা মাছ আনিয়া রাখিল। হঠাৎ বাটী উল্টাইয়া পড়িয়া ম্যাজেণ্টা মাছের গায় লেগে গেল, আর অমনি একটা পাখী হ'য়ে উড়ে গেল। বলত কেমন ক'রে হল!

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৴১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৫। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, বিমর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৬। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। ৯ম সংখ্যা।

জীবন রক্ষক কুকুর।

পাঠক! ছবি দেখিয়া ও উপরের লেখা পড়ায় আমাদের মনের কথা বুঝিয়াছ কি? যদি না বুঝিয়া থাক, তবে বলি শুন। সুইজার্লাণ্ড্ দেশে কেবলই পর্ব্বত—যেমন আমাদের দার্জিলিং অমনি। তবে প্রভেদ এই যে সেখানকার অবস্থা বড় ভয়ানক। সেই প্রকাণ্ড আল্‌স্ পর্ব্বতশ্রেণীর চূড়া, দিন রাতই ভয়ানক শীত, অধিবাসীরা সদাই কাতর। তাহাতে আবার সেখানকার ঋতুর কিছুই ঠিক নাই। হয় ত দিব্য পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর নীল আকাশে একখানিও মেঘ নাই, মনোহর বনফুলগুলি শোভা পাইতেছে, যেন কখনই নষ্ট হইবার নহে;—প্রফুল্ল মনে পথিক গান করিতে করিতে চলিয়াছে। ও হরি! কোথা থেকে হটাৎ বোঁ বোঁ গোঁ গোঁ শব্দে একেবারে ঝড়!! শুধু কি ঝড়? তার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতের চূড়ার মত কি শাল গাছের ঝাঁকের মত ভয়ানক বরফরাশি আকাশকে ছাইয়া ছুটিতেছে, তাহার সম্মুখে কি বড় বড় বৃক্ষ, কি পর্ব্বত-শৃঙ্গ কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। ভারি বন্যা এলে যেমন ঘর বাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যায়, একেবারে কুড়ি হাজার গোলা কামান থেকে সারবন্দি ছুড়িলে সুমুখে যেমন কিছুই থাকে না সব ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়, তেমনি সেই ভয়ানক ঘূর্ণিবায়ুর সম্মুখে পড়িলে পাহাড়ের ধারও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ভয়ানক প্রতাপ! এমন ভয়ানক স্থান দিয়ে ঐ দেশের পথিকদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হয়।

সেইখানে বার্ণার্ড্ নামক একজন ধার্ম্মিক সাহেবের আশ্রম আছে, সেই আশ্রমের ধার্ম্মিক পুরুষেরা এইরূপে বিপদগ্রস্ত পথিকদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা ও আহারাদি দিয়া সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন। ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে করিলেন হয় ত কত লোক তাঁহাদের কথা না জানিতে পারিয়া বিপদে মারা যায়, এজন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক কুকুর পুষিয়াছিলেন। উহারা বেস শিক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং যেখানে কোন বিপদাপন্ন লোক দেখিত তাহাকে উদ্ধার করিয়া আশ্রমে লইয়া আসিত। তাহাদের কাহারও কাহারও গলায় একটা করিয়া ঔষধের শিশি বাঁধা থাকিত, যদি কেহ চাহিত তবে উহা পান করিয়া বেস সবল হইয়া চলিয়া

যাইতে পারিত। এই কুকুরগুলি এমন চমৎকার শিক্ষা পাইয়াছিল যে শুনিলে আশ্চর্য্য ও অবাক হইতে হয়। যদি কোন লোক মৃত প্রায় হইয়া এমন কি ৮ হাত কি দশ হাত তুষারে (গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ) আবৃত হইয়া যাইত, ইহারা বুদ্ধি ও ঘ্রাণশক্তির বলে তাহাও বুঝিতে পারিত এবং দুইদিকের পা দিয়া ঘন ঘন বরফ আঁচড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দিত ও শেষে সেই মৃত প্রায় দেহ বাহির করিয়া মনিবদের নিকট পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইত।

একদা একজন স্ত্রীলোক তাঁহার একটী পুত্রকে লইয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হওয়ায় আর কোথায় স্থানআদি না জানায় তিনি ঐ স্থানের একটী কোণে পুত্রটীকে লইয়া শয়ন করেন। সুইজার্লাণ্ডের রাত্রি—একেবারে অসহ্য শীত, দুজনে ঘোর কষ্ট পাইতেছেন, মাঝে মাঝে পুত্রটী বলিতেছে—"মা! এখানে আমাদের সাহায্য করিতে, কি কেউ নাই?" মা কি বলিবেন, আপনার যাতনায় ও মনে হতাশ হইয়া ভাবিতেছেন। মা হঠাৎ যেই একটু সরিয়া যাবেন অমনি সেই মহা উচ্চ পর্ব্বতের উপর থেকে ভয়ানক এক গহ্বরে পড়ে গেলেন!। কেহই জানিতে পারিল না। হা দুর্ভাগ্য শিশু! মাও হারাইলে? শিশু কিছুই জানে না; তখনও বলিতেছে—"মা! এখানে কি কেউ আমাদিগকে সাহায্য করিবে না?" আবার জিজ্ঞাসা করিল। কে উত্তর দিবে? শিশুটী তখন উঠিল, খুঁজিয়া দেখিল সে একা। উঃ! সেই পর্ব্বতে, সেই অন্ধকারে, সেই শীতে, সেই তুষাররাশির মধ্যে, সেই ভয়ানক স্থানে—সে একা!! দয়ালু পাঠক! স্নেহবতী পাঠিকা! তোমরা ভাবিয়া দেখ। সে বলিল "মা!—মা কোথা?" চীৎকার করিয়া ডাকিল "মা! মা গো!" পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেড়াইয়া আঘাত লাগিয়া কথা তাহারই কাণে ফিরিয়া আসিল—"আ—ও"। সে আরও চেঁচাইয়া ডাকিল "ওগো মা!" দূরে, আরও দূরে তাহার ডাক বায়ুতে ভাসিয়া গেল, আর পর্ব্বতের গা হইতে শব্দ আসিল "ও—আ"। পার্ব্বতীয় বালক শেষে বুঝিল তাহার মা নাই, ও শব্দটা তালি মাত্র। তখন যে তাহার প্রাণ কি হ'ল সে কি লেখা যায়?

অসহায় বালক তখন আস্তে আস্তে সেই এক হাঁটু তুষারের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে আবার রাস্তায় আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—যদি সেখানে কোন পথিক তাহাকে দেখিয়া সাহায্য করে। কিন্তু সে রজনীতে, সে অন্ধকারে, কে সে ভয়ানক পথে চলে?। শীতে কাঁপিতে সে আর পারে না, সমস্ত দিনের পর ক্ষুধায় প্রাণ আকুল, মাকে হারাইয়া মন তাহার দুঃখে পোরা, তাহার উপর আবার সহায়হীন। হতাশ হইয়া সে সেই খানে হাঁটু পাতিয়া বসিল, হাত দুখানি জোড় করিয়া বুকে ধরিল, চক্ষু দুটী,—আহা! জলে ভেসে যাচ্ছে এমন চক্ষু দুটী,—উপর দিকে তুলিল, আর অতি কাতর স্বরে, সরল প্রাণে, ব্যাকুল হয়ে বলিল "পরমেশ্বর! তুমি দয়াময়। এই দীন হীন, অসহায় বালকের আর তোমা বৈ কে আছে? আমার চেষ্টায় যা আছে করিলাম, পিতাগো! ওগো বিপদভঞ্জন! এইবার আমার সব বল চলে গেছে, এখন তুমি আমায় হাত ধরে রক্ষা কর! আমি দেখিছি, মা যখনই বড় বিপদে পড়তেন, তিনি ত তোমা বৈ আর কাকেও ডাকেননি। আর তুমিও তাঁহার সব বিপদই দূর কর্ত্তে। এখন পিতাগো! আমাকে রক্ষা কর!"

এদিকে খুব তুষার পড়িতেছিল, ক্রমে তাহার প্রায় কোমর অবধি ডুবিয়া গেল। আমাদের দেশে যেমন কুয়াশা হয়, তুষারও তাই, তবে কুয়াশা সব জলকণা মাত্র। তুষার বরফকণা;

কাজেই ভয়ানক শীতল। শীতে তাহার অঙ্গ সকল ক্রমে অবশ হইয়া এল। এমন সময়ে হঠাৎ বোঁ বোঁ রবে সেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যা, সেই রকম ঝড় ভয়ানক বেগে এসে পড়্‌ল। বেচারা ভয়ে শীতে নির্জ্জীব হয়েছিল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে যেন বল পেলে, অমনি তাড়াতাড়ি একটা ছোট গুহায় গিয়া লুকাইল। ঝড় সমস্ত তুষারগুলকে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে, এই রকম নেড়ে নেড়ে নিয়ে বেড়াইতে লাগিল। আর মড় মড় ক'রে গাছ সব ভাঙ্গিতে লাগিল, পর্ব্বতের কোণগুলা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু শিশুটীর কিছুই করিতে পারিল না। তবে বড়ই শীত বৃদ্ধি হইল। শীতে প্রায় সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে তাহার মুখে যেন কাহার গরম নিশ্বাস লাগিল।

অমনি চক্ষু খুলিয়া দেখে যে ভয়ানক একটা কুকুর! কুকুরটা কিন্তু খুব স্নেহভাবে তাহার গা হার্ত সব চাটিয়া গরম করিতে লাগিল; দেখিয়া সে ভীত না হইয়া বরং সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিল ও পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিল। ক্রমে একটু সুস্থ হইলে কুকুরটা দাঁড়াইল। বালকও চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তখন সেই স্নেহপূর্ণ জীব উপুড় হইয়া শুইয়া এমন ভাব দেখাইল যেন সে বালককে আপন পৃষ্ঠে উঠিতে বলিতেছে। বালক তাহাই করিল, তখন হৃষ্টমনে পথ চিনিয়া কুকুর আপনাদের সেই আশ্রমের দিকে চলিল। ঝড়ও অনেকটা থামিয়াছিল। সে স্বচ্ছন্দে ঐ দেখ বালককে পিঠে করিয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া চীৎকার করিয়া দ্বার খুলিতে বলিতেছে। *ধন্য বুদ্ধি কুকুরের!! ধন্য দয়া ঈশ্বরের!!!*

এই বালককে একজন ভদ্রলোক পরে ভরণ-পোষণ করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কখনও মাকে ভুলে নাই।

ঘড়ি।

তি প্রাচীনতম কাল হইতে ঘড়ি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তোমরা মনে করিও না যে ঘড়ি তোমাদের ইংরাজ বাহাদুরেরাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যখন ইংরাজ নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না, এদেশেতে ত নয়ই, কোন স্থানেই যখন ইংরাজ হয় নাই, তখনও এই দেশে ঘড়ি ছিল, এ দেশ সকলের চেয়ে পুরাতন, এবং আগে যখন সব দেশ, এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা—সমস্ত অজ্ঞান ছিল, অসভ্য বনের পশুর মত ছিল, তখনও আমাদের দেশের লোকেরা সুসভ্য ও মহা বুদ্ধিমান ছিলেন। তখন তাঁহারা সময় নিরূপণ করিবার জন্য যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহাকে যদি ঘড়ি বলা যায়, তবে তখনও নিশ্চয় ঘড়ি ছিল।

সে যাহা হউক, আসল কথা এই যে সময়টা দেখা নাকি চিরকালই দরকার, সময় দেখিবার জন্য তেমনি চিরকালই একটা না একটা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। বিলাতের প্রাচীন রাজা 'আলফ্রেড্ দি গ্রেট' এক রকম বাতী ব্যবহার করিতেন সেই বাতী পুড়িতে যে সময় লাগিত

সেই অনুসারে তিনি ঘণ্টা নিরূপণ করিতেন। আমাদের দেশে তিন রকম উপায় দেখা যায়। (১ম) কোন পরিষ্কার স্থানে একটা কাটী সোজা করিয়া পুতিয়া রাখা হয়, এবং প্রতিদিন সূর্য্যের গতি বুঝিয়া ঐ কাটীর ছায়া যখন যেখানে যেখানে পড়ে সেইখানে সেইখানে দাগ দিয়া রাখা হয়। তা হলেই এক বছর বাদে কাটীর ছায়া আবার ঘুরিয়া ঠিক প্রথম দিনের দাগে আসে। তার পর থেকে আবার ঘুরিতে আরম্ভ করে। কাজেই বেশ এক রকম মোটা মুটী সময় ঠিক করিবার উপায় হয়। ইহাকে সূর্য্য-ঘড়ি বা Sun-dial বলে। কিন্তু এতে সুবিধা হয় না, কেন না, যেদিন সূর্য্য মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন, ও রোজ রাত্রে সময় দেখার উপায় থাকে না। আর একটা উপায় আছে তাহার নাম 'বালির ঘড়ি'। একটা ফুটো ওয়ালা বাক্সে ঝুরো বালি রাখা হয়, ঐ বালি ঝুর ঝুর ক'রে পড়িতে থাকে, যতক্ষণে সমস্ত প'ড়ে যায় ততক্ষণে এক ঘণ্টা হয়। আবার সমস্ত বালি কুড়াইয়া লইয়া বাক্সে পূরিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এও সুবিধা নয়। আরও এক রকম আছে তাহাকে জলঘড়ি বলে। একটা পাত্রে খানিকটা জল রাখা হয়, তাহাতে একটা পাৎলা বাটী ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহার তলায় একটী ছোট ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দিয়া একটু একটু করিয়া জল উঠিতে থাকে। বাটীর ভিতর দিকে বা বাহির দিকে কয়টী দাগ করা থাকে। ক্রমে যত অধিক জল বাটীর ভিতর উঠে ততই বাটী ভারী হইয়া ডুবিয়া যাইতে থাকে। এবং ঐ এক একটী দাগ পল, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি বুঝায়। পলের দাগ অবধি ডুবিলে এক পল হইল বুঝা যায়, দণ্ডের দাগ অবধি ডুবিলে দণ্ড হইল বুঝা যায়। আবার ৭॥০ দণ্ডে একটা প্রহরের দাগ থাকে, ঐ দাগে জল উঠিলে এক প্রহর হয় বুঝা যায়। সাধারণতঃ এক প্রহর হইলে বাটীটি ডুবিয়া যায়। অমনি একজন লোক যে পাহারা থাকে, সে সে বাটীটি আবার ভাসাইয়া দেয়; আবার, জল উঠিতে থাকে। এইরূপে দিন রাত্রি পাহারা রাখিয়া এই জল-ঘড়ির দ্বারা বেস এক রকম সময় নিরূপণ হয়।

এই দুই তিন জাতীয় ঘড়ি এখনও অনেক প্রাচীন মন্দিরে ও দেবালয়ে আমরা দেখিতে পাই। কাশীতে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড মান মন্দির আছে, সেখানে একটী বড় সুন্দর সূর্য্য-ঘড়ি আছে। অনেক বড় বড় জ্যোতির্বেত্তা সাহেব ইহা দেখিতে যান। আরও অন্যান্য অনেক স্থলে বালির ও জলের ঘড়ি দেখা যায়। কিন্তু প্রায় সকল স্থলেই এখন বিলাতী ঘড়ি ব্যবহার হয়, ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার জিনিষ। ইহাতে দিন রাত্রি পাহারা দিতে হয় না; কোন গোলই নাই. কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার দম দিলেই হইল। তাহাও আবার বড় বড় ঘড়িগুলার কেবল ৭ দিন অন্তর একদিন। মাসে একদিন, বৎসরে একদিন দম এমন ঘড়িও আছে শুনিয়াছি। দেখ দেখি কেমন সুবিধা! এই সব ঘড়ির ভিতর ত সাধারণেই কত কৌশল, এক একটাতে আবার এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। কোন কোনটার ১৫ মিনিট বাজে, কোনটার ঘণ্টা বাজিবার সময় একটা পরী আসিয়া নাচিয়া গাইয়া তার পর একটা মুগুরের দ্বারা একটা ঘণ্টা বাজাইয়া আবার নাচিতে নাচিতে যায়। কোনটায় ফি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে একজন কুলী দাঁড়াইয়া একটা মুগুরের দ্বারা একটা চাঁইএর উপর ঠক্ ঠক্ ক'রে মারে আর যারা দেখে তাদের মুখ-পানে চায়। কোনটার বা ঘণ্টা বাজার সময় একটা কোকিল পাখী বাহির হইয়া 'কু' 'কু' ক'রে শব্দ করে, তাই ঘণ্টা বাজান হয়। আর কত লিখিব?

এক রকম ঘড়ি আছে তাহাদিগকে 'এলার্মিং' ক্লক্ বলে; এগুলো বড় উপকারী। দম দিয়ে ঠিক ক'রে রাখিয়া শোও, ঠিক যটার সময় তুমি মনে করিবে তটার সময় রাত্রে এমনি 'ঘন্ ঘন্' শব্দ করিবে যে তুমি অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে না পড়ে থাকতে পারবে না। বাঙ্গালায় এদের বলে ঘুম ভাঙ্গানে ঘড়ি। ছাত্রদের এটা ভারী উপকারী। দামও বেশী নয়। আজ কাল এ রকম একটা ভাল ঘড়ি ১০।১৫ টাকায় পাওয়া যায়, ৫৲ টাকাতেও ছোট রকম পাওয়া যায়। 'ওযাচ্' অর্থাৎ ট্যাঁক ঘড়িও আজ কাল যে কত রকম তার ঠিক নাই। তাদের মধ্যে দুদল, কতকগুলোর বেশ ঢাকনি আছে,তাদের বলে "হণ্টিং," আর যাদের ঢাকনি নেই তাদের বলে "ওপ্‌ন্‌-ফেস্।" শেষের গুলিতে বেশ সুবিধা,পকেট থেকে বাহির করিলেই দেখা যায় কটা বেজেছে। খুব দাম দিয়ে কিনিলে এক রকম ওয়াচ্ আছে তারা বেস বাজে। যখন ইচ্ছা, রাত্রে অন্ধকারে, ঘুম ভাঙ্গিলে একটা স্থান একটু টিপিয়া ধরিলেই কটা বেজেছে, কত মিনিট হয়েছে তা পর্য্যন্ত বলে দেয়। মানুষের বুদ্ধির যথার্থই সীমা নেই। তোমরা বড় হ'য়ে যদি এ বিষয়ে বুদ্ধি খরচ কর তা'হলে হয়ত আরও কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল যে বাহির ক'রবে তার ঠিক কি? পারবে?

সে যাহা হউক, কিন্তু আজিকার এত কথার পর একটী কথা আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে—যে, সময় বড় দরকারী, এত দরকারী যে সে বিষয় এখানে বলাই অনাবশ্যক। এমন যে দরকারী সময় তাহার দিকে সর্ব্বদাই খুব সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক, যেন একটুও ফাঁকি দিয়ে চলে যায় না। যে টুকু যাবে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না এমন যে দরকারী জিনিষ, আমাদের মতে তার চেয়ে আর দামী জিনিষ নাই—তার জন্য যদি কিছু খরচ করা দরকার হয়, তাও সন্তুষ্ট মনে করা উচিত। আজ কাল যারা শ্রেষ্ঠ জাতি সেই ইংরেজদের দেশে প্রায় প্রত্যেক গাড়োয়ান, কি মুটেমজুর, এমন কি সামান্য জুতোসেলাইওয়ালারও প্রায় ঘড়ি থাকে। তারা জানে যে সময়ই তাদের জীবন, আবার সময়ই তাদের জীবন ধারণ অর্থের উপায়। ২৪ ঘণ্টায় যাদের এত খরচ, তার ফি ঘণ্টায় এত টাকা আয় হচ্ছে কি না দেখা চাই। এই জন্যেই তারা এত বড় জাত। তাই আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের দেশের বালক বালিকারা সকলেই ঘড়ির এ মহৎ গুণ জানিয়া এক একটী ঘড়ি ব্যবহার করেন। অনেক ছেলে দেখি প্রায়ই দেরী করিয়া স্কুলে আসেন, আবার অনেকে ৯টার সময় অবধি এসে বসে থাকেন। কাজেই,—ঘড়ি নেই কি করেন, সময় ঠাওরাইতে পারেন না। রেলের গাড়ীতে যাইতে অনেকেই দেখিয়াছি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে যান না; কাজেই তাঁহাদিগকে 'ট্রেণ মিস্' করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অনাহারে হয়ত ষ্টেসনে বসিয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে হয়। ঘড়ি থাকিলে এ সব হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা যখন সকলে ঘড়ি ব্যবহার করিতে শিখিয়া সময়ের মূল্য বুঝিবে, তখনই বাস্তবিক দেশের উন্নতি হইবে। ছাত্রদিগের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে আবশ্যক। ৪ খানি বই পড়িতে হইবে, এত টুকু সময় আছে, তাহার মধ্যে ঠিক ভাগ করিয়া পড়িলে তবে পড়া ঠিক হইবে নহিলে হয় না। এই সব নানা কারণে ছাত্রদের ঘড়ি নিতান্ত আবশ্যক। আজ কাল দামও খুব কম। আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এক একটী ঘড়ি ব্যবহার করিবেন। কিন্তু সাবধান! যেন নষ্ট না হয়। আরও সাবধান! যেন ঘড়ি আছে বলিয়া কারো অহঙ্কার না হয়।

আমি দুঃখী কেন?

পাড়ার ভূষণ ভারি গবিবেব মেয়ে। তাব মা ছাড়া আব কেউ নেই। সে যখন খুব ছেলে মানুষ তখন তার পিতাব মৃত্যু হয়। গ্রামেব এক ধারে একখানি কুঁড়ে ঘব আছে, তাইতে দুজনে থাকে; আর ভরণ পোষণের ভাব তাব মাব উপর। ভূষণ বাড়ীতে বসিয়া খেলা করে, কি ঘবের কোন কাজ কর্ম্ম করে, আব তার মা ভিক্ষা কবিতে যায়। একদিন তাহাব বড় ইচ্ছা হইল যে, সে ওপাড়াব ছেলেদেব সঙ্গে বিকালে খেলা করিতে যাইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যাওযাই স্থিব কবিল। গ্রামেব ওপাড়াতে অনেক বড় মানুষের বাস, আব তাদেব আদবের ছেলে মেয়েবা খেলা করে। ভূষণ সেদিন বৈকালে তাদেব কাছে যাইতে যাইতে দূব হইতে তাদেব খেলা হইতেছে দেখিতে পাইল, ও তাহাব মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। সে ধীবে ধীরে অগ্রসব হইতেছে এমন সময়ে তাদেব একজন ছেলে যেমন তাহাব দিকে তাকাইতেছে ভূষণ অমনি তাহার মুখ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এমন সময় সে ছেলেটী বলিয়া উঠিল "ওরে ভাই! ওপাড়ার ভিখারীব মেয়ে ভূষী আমাদেব সঙ্গে খেলা করতে আস্‌ছে।" আর সব ছেলেরা অমনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিয়া উঠিল "কি? ভিখারীব মেয়ে হয়ে আমাদেব সঙ্গে কোন্ লজ্জায় খেলা কব্‌তে আস্‌ছে রে!—আ মরণ! পর্ত্তেও একখান কাপড় যোটে নি!—ও ভাই! দেখ্‌ দেখ্‌ একখানা ছেঁড়া নেকড়া, প'রে এসেছে।" এই বলিয়া কতকগুলা ছেলে তার পিছে পিছে তাড়া করিল। আর—আহা!—বেচারী ভূষণ প্রাণপণে ছুটিল। তাব কাণ, মুখ, লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোক দিয়া ঝর ঝব কবে জল পড়ছে, আব দুঃখিনী ভূষণ উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে!—পাঠক পাঠিকাগণ। ইহাকে দেখিয়া তোমাদের কি একটুও দুঃখ হয় না? যাহা হউক সে এই প্রকারে ছুটিতে ছুটিতে ঘোষালদেব দীঘিব ধাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, ও সেইখানে বসিয়া হাঁটু দুখানির উপব মাথাটী রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাব বুক তখন কেমন কবিতেছে তা সেই জানে, আহা! তাব আব কেউ নাই, কেবল শোক দুঃখে সান্ত্বনা পাইবাব এক মা আছে, তিনিও আবাব নিকটে নাই। সে মনের এত কষ্ট কাকেই বা বলিয়া একটু সুখী হয়?—সে বোধ হয় মনে কবিতেছিল যে "আমি মাব কোলে বসিযা আছি"।—কাঁদিতে-কাঁদিতে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে বাত্রি হইল। দিব্যি চাঁদ উঠিযাছে, আকাশে মেঘ নাই। আব সেই দীঘিব ধাবে বসিয়া ভূষণ কাঁদিতেছে, আব কেহ কোথাও নাই। সে কিন্তু রাত্রি হইয়াছে জানিতে পাবে নাই। এদিকে ভূষণেব মা সমস্ত দিন ভিক্ষা কবিযা বাটী আসিযা দেখেন ভূষণ অন্য দিনেব ন্যায় বাড়ী নাই। তখন তিনি তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। অনেক যায়গা খুঁজিয়া কোথাও পাইলেন না। অবশেষে তাঁহাব মনে পড়িল, যে ভূষণ মাঝে মাঝে ঘোষালদেব দীঘিব ধারে বেড়াতে যায়। অতএব সেই দিকেই খুঁজিতে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, ভূষণ হাঁটুব উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে; তিনি কিছু না বলিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

ভূষণ এইরূপে কাঁদিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে হইল—"আমি দুঃখী কেন?" অমনি তার কান্না থামিয়া গেল, সে পূর্ব্বের সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেল, আর আস্তে আস্তে বলিতে

লাগিল—"আমি দুঃখী কেন? আমি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আছি, আর তারা না হয় ভাল ভাল কাপড় পরিয়া আছে, এইজন্য কি আমি দুঃখী? কেন? এতে ত আমার কোন কষ্ট নাই। যখন শীত করিবে তখন আমাদের সেই ছেঁড়া কাঁথা খানি গায়ে দিব। তবে ছেঁড়া কাপড়ে আমার দুঃখ কিসের? তাদের না হয় বড় বড় বাড়ী আছে তা থাকিলেই বা। আমাদের ত বেশ কুঁড়ে ঘর খানি আছে। অতো বড় বাড়ী আমাদের কাজ কি? কেবল মা আর আমি বইত নয়? তবে আর কি? আমরা কুঁড়ে ঘরখানিতে ত বেস্ থাকি? ওতে আমাদের কোন কষ্ট নাই। তাদের ভাল বিছানা আছে আমাদের তা নেই। তা হ'ক—আঃ! আমি শীত করলে মার বুকের ভিতর গিয়া শুয়ে থাকি। তার চেয়ে আবার ভাল বিছানা! আমার তায় কাজ নাই; পরমেশ্বর আমার মাকে বাঁচিয়ে রাখুন। তাঁর বুকই আমার সবচেয়ে ভাল বিছানা। তাদের টানা পাখা আছে। বেস্, আমার তা কাজ নাই। সন্ধ্যাকালে যখন মা আর আমি আমাদের ঘরের পাশে ঘাসের উপর বসে থাকি তখন কেমন বাতাস হয়; তার কাছে আবার টানাপাখা? টানাপাখায় নাকি তেমন বাতাস হয়? তাদের অনেক টাকা আছে। তা থাক্; আমাদের টাকা নাই বটে—কিন্তু কেন? টাকায় কাজ কি? আমার মা সমস্ত দিন ভিক্ষা করে এনে রাখেন, আর সকালে ও সন্ধ্যাকালে আমায় রেঁধে দেন, বেস্ত খেতে পাই; তবে টাকায় কাজ কি? তাদের সব ঝাড় লণ্ঠন আছে। তা ওসব আমাদের কাজ কি? আমাদের একখানি ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলে। আর যখন বাহিরে বসি তখন কেমন চাঁদের আলো হয়—আহা কেমন! ঝাড় লণ্ঠন নাকি অমন হয়? তাদের অনেক চাকর চাকরাণী আছে, গাড়ি ঘোড়া আছে। তা সে সবত আমাদের দরকার নেই। মা যখন রাঁধেন আমি যা পারি তাঁহাকে সাহায্য করি। তার পর তিনি ভিক্ষা করিতে যান, আমি খেলা করিতে যাই। তবে আর কি? চাকর চাকরাণী ও সব আমাদের দরকার? তবে আর আমাদের কিসের অভাব? আচ্ছা, তাদের সব বাপ্ আছে, আমার বাবা নাই। এই বলিয়া ভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করে রহিল, তাহার পর একটু উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি আমার বাপ নাই?— আমার পিতা পরমেশ্বর! আমার বাপ জগতের রাজা।।" এই বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল, ও আহ্লাদে মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তবে নাকি আমি দুঃখী?—আমি রাজার মেয়ে।" তখন ভূষণ দেখিতে পাইল, তাহার মা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। অমনি সে লাফাইয়া তাঁহার কোলে উঠিল ও গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা! আমরা দুঃখী কিসে?" তাহার মা তখন তাহার মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা। তুমি আজ এখানে এসব কথা ভাবিতেছিলে? ভূষণ বলিল "মা। আজ আমি ওপাড়ার ছেলে-দের সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছিলাম, তারা আমাকে দুঃখী বলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তা মা আমি দুঃখী কিসে? তারা না হয় ভাল কাপড় পরে, আর আমি ছেঁড়া কাপড় পরি, তারা কোটা বাড়ীতে থাকে, আর আমি তোমার সঙ্গে কুঁড়ে ঘরে থাকি; তারা ভাল বিছানায় শুয়ে থাকে, আমি মা ছেঁড়া কাপড় প'রে তোমার বুকের ভিতর কেমন শুয়ে থাকি। মা! এতে যে আমার বড় সুখ হয়? আবার তাদের টানাপাখা আছে; আমাদের তা নেই। তা নাই থাকল মা! বৈকালে কেমন তোমাতে আমাতে আমাদের ঘরের পাশে ঘাসের উপর বসে বাতাস খাই। তাদের টাকা আছে; তা আমাদের টাকা কাজ কি মা? আমরা ত বেস্

খেতে পাই। তবে বড় মানুষী ক'রে অহঙ্কার দেখাবার দরকার কি? সে কি ভাল? না সে আরও পাপ! ওপাড়ার ছেলেরা ত বড়মানুষ; তাদের ব্যবহার দেখ্‌লে কি আর তাদের মত হ'তে ইচ্ছা যায় মা? আমাদের, তাদের মত চাকর চাকরাণী নেই, ঝাড় লণ্ঠন নেই, গাড়ী ঘোড়া নেই, তা নাই থাক্‌ল মা! চাকর, গাড়ী এ সব আমাদের কাজ কি? আর ঝাড় লণ্ঠনের বদলে দেখ দেখি কেমন চাঁদ রহিয়াছে। আহা কেমন! মা। ও চাঁদ ত আমাদের। তুমিই ত বলিয়াছ আমাদের পিতা পরমেশ্বর এ সব তৈয়ার করেছেন, সব মানুষ ত আমাদের ভাই বোন, বা! আমাদের এত ভাই এত বোন! তবে আমাদের কিসের দুঃখ মা?"

এত ছোট বালিকা ভূষণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহার আহ্লাদে বুকের ভিতর কি হইতে লাগিল ও চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি ভূষণকে বুকের উপর চাপিয়া লইলেন ও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর ভূষণের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "ভূষণ মা। তুমি ঠিকই ভাবিয়াছ। আমরা কিসের দুঃখী? আমরা ত দুঃখী নই। টাকা থাকিলেই কেবল মানুষ সুখী হইতে পারে না। এক দলের লোক আছেন তাঁহারা খুব ধনী ও অনেক গাড়ী ঘোড়া, ফুল-বাগান, চাকর চাকরাণী, ঝাড় লণ্ঠন, গদি বিছানা, ইত্যাদি মহা ধুমধামের মধ্যে থাকেন। কিছুরই অভাব নাই, মহাসুখ। আর এদিকে দুঃখীদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ধন লইয়া আপনি সুখ-ভোগ করেন আর থাকেন, আর কোন কাজ নাই। আর এক শ্রেণীর লোক, তাঁহারাও খুব ধনী, ইচ্ছা করিলেই সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এ সুখকে সুখ মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন "এ সুখ কত দিনের জন্য! যখন এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব, তখন সকলেই সমান হইব; অতএব বাস্তবিকই সকলে ভাই বোন।" কাজেই তাঁহারা সমস্ত ধন আপনারা ভোগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীর চারিদিকে যে সকল দরিদ্র লোক হাহাকার করিতেছে তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া নিজের সুখ ফেলেও তাহাদেরি দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হন।

ওদিকে যাঁহারা খুব গরিব, আমাদের মত, কি আমাদের চেয়েও, তাঁহাদের মধ্যেও একদল ধন নাই বলিয়া দুঃখিত নন। তাঁহারা তোমার মতের লোক। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের পিতা ঈশ্বর এবং সকলেই তাঁহাদের ভাই বোন। তাঁহারা তাঁহাদের কিছুই অভাব দেখিতে পান না। তাঁহাদের ছোট কুটীর খানিকেই রাজার বাড়ী মনে করেন। চন্দ্র তাঁহাদের ঝাড় লণ্ঠন হয়। বনের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে, তাঁহারা সেই গুলিকেই তাঁহাদের ফুল বাগান মনে করেন। তাঁহাদের নিজের পা দুটিই তাঁহাদের গাড়ী ঘোড়া হয়; তাঁহাদের হস্তই তাঁহাদের চাকরের কার্য্য করে। এইরূপে, সেই কুঁড়েটীর মধ্যে যে সকল সুখভোগ করেন তাহাই রাজ-সুখ মনে করেন। আবার, যখন তাঁহারা ভাবেন যে জগতের রাজা পরমেশ্বর তাঁহাদের পিতা ও তাঁহারা রাজপুত্র ও রাজকন্যা তখন তাঁহাদের আর সুখের সীমা থাকে না।

আবার একদল লোকের কথা শুন; তাহারাও ইহাদের মত গরিব কিন্তু তাহারা আর এক রকম। তাহারা টাকা নাই বলিয়া বড় দুঃখিত। সর্ব্বদা টাকার অন্বেষণে বেড়ায় ও হয় ত তাহার নিমিত্ত কত পাপ কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। তাহারা জানে না যে সুখ তাহাদের কুঁড়ে ঘরের মধ্যেই রহিয়াছে।

তবে এখানে চারি দলের লোক দেখা যাইতেছে। ১ম দল খুব বড মানুষ, গরিব দুঃখীকে দয়া করে না, আপনাদের সুখের জন্যই ব্যস্ত, আর মনে করে যে তাহাদের সকল ধনই তাহাদের নিজের সুখের নিমিত্ত। ২য় দলের লোকও খুব বড়, কিন্তু আপনাদের সুখের দিকে তত দৃষ্টি নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া ও সব মানুষকে ভাই বোন জানিয়া সকলের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। ৩য় দলের লোক আমাদের মত কিম্বা আমাদের চেয়ে গরিব, কিন্তু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট। তাঁহারা আপনাদিগকে রাজপুত্র ও রাজকন্যা মনে করেন এবং তাঁহাদের কিছুই অভাব নাই। ৪র্থ দলের লোকও খুব গরিব, কিন্তু সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, আর কোথায় সুখ, কোথায় ধন করিয়া বেড়ায়। এই চারিদলের মধ্যে তুমি কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী মনে করিবে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের লোককে সুখী বলিবে। তবে বেস্ দেখা গেল যে, কেবল টাকা থাকিলে লোক সুখী হইতে পারে না—আরও কিছু চাই। আবার অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও দুঃখী হয় না, যদি তাহার সেই বস্তু থাকে।

তবে সেই বস্তু কি? এমন কি বস্তু আছে যাহার অভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও লোক বাস্তবিক সুখ পায় না; এবং অতি দরিদ্র হইলেও, যাহা থাকিলে মানুষ খুব সুখী হইতে পারে? সে বস্তুটী এই—ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া ও সকল মানুষকে ভাই বোন জানিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা, ও সকলকে ভালবাসা। ইহা যাহার আছে, অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও সে কেন দুঃখী হইবে? তখন ভূষণ মার কোলে বাড়ী যাইতে যাইতে ভাবিল "যথার্থই ত, আমি দুঃখী কেন?" আমরা বলি "না ভূষণ! তুমিই যথার্থ ধনী।" পাঠক পাঠিকাগণ! কি বল?

৺ কৃষ্ণদাস পাল।

একটা কথা আমাদের বড় মনে হয়, সেটা আজ তোমাদিগকে বলিব। যখন শ্মশানে যাই, বা যে কোন স্থানে বসিয়া থাকি, বা যখন গঙ্গাতীরের দিকে বেড়াইতে যাই, তখনই কত শত শত লোকের মৃত্যু দেখি, শুনি ও বলি। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য দেখি যে এই শত শত লোক রোজ মরিতেছে, এত লোক প্রতিদিন এ সুখময় পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কাহারও খবর কেউ রাখে না, কাহারও কথা লইয়া কেহ নাড়াচাড়া করে না, কাহারও মৃত্যু বিষয়ে কেহ দুঃখ করে না, কেহ "হায় হায়" করে না। রামধন, হরিধন, গোপাল, মাধব—কত লোকই না রোজ মরিতেছে; কত লোকই না রোজ ইহলোক ছাড়িয়া যাইতেছে,—কে তার খোঁজ

লয? কেহই না। হয়ত তাহার আপনার স্বজন কেউ ছিল,—মা বাপ, ভাই বোন,—তাবাই ২।৪ দিন কাঁদিল। হয়ত তাহাব পাড়াপ্রতিবাসী জনকতক লোক তাব মৃত্যুতে দুঃখিত হয়। আবাব নযত পাডাব লোক "আঃ! বাঁচলেম, হাড় জুড়াল" বলে তাহাব মবণে খুসী হইয়া ঠাকুবদেব তুলসী দেয়। আব এক দিকে যে দেখি একজন কেশব সেন মবিলেন, আব অমনি দেশ বিদেশ, সমস্ত ভাবতবর্ষ, সমস্ত ইউবোপ, আমেরিকা পর্য্যন্তও হাহাকাবধ্বনি পড়িয়া গেল; একজন শ্যাম বিশ্বাস প্রাণত্যাগ কবিলেন, আব বাঙ্গালা দেশ-শুদ্ধ লোক তাঁহাব অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহেব গান গাইযা মহা শোক কবিতে লাগিল; একজন কৃষ্ণদাস পাল ৪৫ বছব বয়সে মবিলেন, আব অমনি বাঙ্গালা, বেহাব, উডিষ্যা, পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ,—সর্ব্বত্র, "হায় কি হইল!" শব্দে পূবিয়া গেল!—এব মানে কি জান? এ বকমটা হয় কেন? এই যে শত লোক রোজ মবিতেছে, ইহাবা কি মানুষ নয়? তবে এদেব মবণেব সংবাদ কেহ দেয় না কেন? আর ঐ সব লোক-গুলিবই বা মৃত্যুতে মানুষ কাঁদে কেন? এ প্রশ্নেব উত্তব অতি সহজ।—এঁবা বুদ্ধি, চবিত্র বা ধর্ম্মেব গুণে পৃথিবীব বিস্তব উপকাব কবিয়া-ছেন, তাই আজ এঁদেব মরণে দেশশুদ্ধ লোক কাঁদিতেছে। "সখা"ব পাঠক পাঠিকাগণ। তোমবা কি দেশের লোক নও? তোমবা কি এ দুঃখেব দিনে চক্ষেব জল ফেলিবে না? তোমা-দের জননী-স্বরূপ দেশেব ভাল ভাল, বাছা বাছা, বড় বড় ছেলেরা সব মরে যাচ্ছেন দেখে কি তোমাদের প্রাণে দুঃখ হবে না? কেন হবে না? কে বলে হবেনা? তবে তোমরা শিশু, সকলে জাননা এঁবা কেন বড় লোক ছিলেন। তাই, এঁদের না জানাতেই তোমরা দুঃখও করিতেছ না। তবে এস, কেশব বাবু ও শ্যামাচরণ বাবুর জীবনের অনেক কথা তোমবা পড়িয়াছ; আজ মহামান্য অনবেবল্ রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সি, আই, ঈ, মহাশয়েব জীবনের গুটিকতক কথা বলিযা দিব।

এই মহাত্মা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে জন্মগ্রহণ কবেন, ইহাঁব পিতাব নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র পাল। আহা। দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা উভযেই এই নিদারুণ শোকেব জ্বালা সহ্য কবিবাব জন্য এ পর্য্যন্ত বাঁচিযা আছেন। কৃষ্ণদাস বাবু বালক কালে পাঠশালে পড়িতেন, পবে ওবিএন্টাল্ সেমিনাবী বিদ্যালয়ে ইংবাজী ক্লাশে ভর্ত্তি হন। তখন তাঁহাব বযস ১০ বৎসব মাত্র, কিন্তু ঝাঁ ঝাঁ কবিযা 'ডবল্ প্রোমোশন্' পাইযা শীঘ্র শীঘ্র খুব শিখিতে লাগিলেন। তিনি অতি-শয পবিশ্রম কবিযা পড়িতেন, এজন্য প্রায় সর্ব্ব-দাই ক্লাশে প্রথম থাকিতেন। ঐ স্কুলে ছয় বছব পড়িয়াই তথাকাব ইংবাজী পড়া ভাল হয় না বোধ হওযায স্কুল ছাড়িয়া একজন সাহেবেব কাছে ইংবাজী পড়িতে লাগিলেন। ভাল ইংরাজী শিখিব, এ ইচ্ছাটা তাব ববাবব ছিল। এজন্য দিনকতক এইরূপে শিখিয়া শেষে "হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ" নামক তখনকাব একটা বড় কলেজে তিন বছব খুব মন দিয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাব খুব উন্নতি হইয়াছিল। উনিশ বছর বয়সেব সময তাঁহাব এ কলেজের পড়াও শেষ হইল, তখন তিনি বাডীতে, সাধাবণ পুস্তকা-গারে ও ঐ কালেজে বসিয়া বসিয়া দিন রাত পড়িতে আবম্ভ করিলেন। আহা! পড়াশুনা যে কি মধুময় জিনিষ, তা যাবা বেশী পড়ে তারাই বুঝিতে পারে। পড়িয়া তিনি ক্লান্ত হইতেন না, এতও পড়িতে পারিতেন! কত বৈই যে পড়িয়া ফেলিয়াছেন তা বলা যায় না! কবে আমরা সকলে পড়াশুনার এই সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করিয়া অন্য সব বৃথা আমোদকে

নীচ মনে করিতে শিখিব? হায়! কবে সমস্ত বালক বালিকাগণ প্রাণ মন, সুখ ঐশ্বর্য্য, সব পণ করিয়া, জ্ঞান ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া মানুষ হইবার জন্য যত্ন করিবে? উঃ! যখন এখনকার সব ছেলেদের পড়াতে আলস্য দেখি, তখন আপনার অঙ্গুল আপনি কামড়াইতে ইচ্ছা করে, যে হায় রে! ইহারা চেষ্টা ও যত্ন করিলেই বড়লোক হইতে পারিত, ইচ্ছা করিয়া নীচ কেরাণীগিরি করিবে, সাহেবের জুতা খাইবে, এজন্য পড়াশুনায় হেলা করিয়া বৃথা আমোদে সময় কাটাইতেছে।। এখন বাবা খেতে পরতে দিচ্ছেন, স্কুলের মাহিনাও দিচ্ছেন, এর পর যে কি দশা হবে একটীবারও ভাবে না। হায়। হায়! আর সহ্য হয় না। বালকগণ! তোমাদের প্রত্যেককেই বলি, হাতে ধরে বলি, বৃথা সময় নষ্ট আর কোরো না। পড়, পড়, পড়;—বড়লোক হবার উদ্যোগ আয়োজন কর, চেষ্টা কর, যত্ন কর, প্রতিজ্ঞা কর,—দেখ দেখি হইতে পার কি না? সব বড়লোকই এই রকম ক'রে হন, তোমরাই বা কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক মূর্খ, নীচ, সামান্য লোক হইয়া থাকিবে? তার পর, সে যাহা হউক, কি বলিতেছিলাম—কৃষ্ণদাস বাবুর পড়ার কথা। অনবরত পরিশ্রম করিয়া তিনি পড়িতেন আর চেষ্টা করিতেন যেন তাঁহার ইংরাজী রচনা ভাল হয়। সর্ব্বদাই সংবাদ পত্রে লিখিতেন, এবং তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য এমনি লিখিতেন যে, যে কাগজেই দিতেন সেই আদর করিয়া লইত। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন সুলেখক ও খুব ভাল লোক বলিয়া জানিত হইলেন। হাঁ, ভাল কথা।—এই সময় হইতেই বিচারশক্তি ও বক্তৃতা করিবার শক্তির উন্নতি করিবার জন্য তিনি একটী ছোট "ক্লবের" স্থাপনা করিয়া সেখানে নানাপ্রকার ভাল ভাল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই ক্লবের প্রায় সব সভ্যই এখন বড়লোক। আমরা এই জন্য এই রকম "ক্লব", সভা প্রভৃতি বড় ভালবাসি। এগুলি যেন "বীজতলা" জমী, পরে যাঁহারা বড়লোক হন এখান হইতেই তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা পান।

এই অবিশ্রান্ত যত্ন পরিশ্রম ও চেষ্টায় কত বড় ফল হইল শুনিবে? শুনিলেই তোমরা অবাক হইবে। তাঁহার যখন বয়স কেবল মাত্র বাইশ বছর, যে বয়সে এখন অনেক ছেলে এণ্ট্রেন্স ও পাশ করিতে পারে না, এত কম বয়সেই তিনি সুবিখ্যাত, দেশের মধ্যে মান্য "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক প্রধান সংবাদপত্রের পূরো সম্পাদক হন।। কি আনন্দের কথা! বাইশ বছরের ছেলে এত বড় একটা প্রকাণ্ড কাজের ভার মাথায় লইলেন! তাঁহার হাতে কি এ ভার অন্যায় হইয়াছিল? তিনি কি এত বড় কাগজ ভাল চালাইতে পারেন নাই মনে কর? না, তা মনেও স্থান দিও না। বড় হইলে জানিতে পারিবে যে এই পেট্রিয়ট কাগজই—আজ কাল সমস্ত ভারতবর্ষে যত খবরের কাগজ আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল—কেবল তাঁহারই দক্ষতায়!! তার পর আর এক ধাপ উঠিলেন এই যে—সমস্ত বাঙ্গালা ও বেহারের যত জমীদার আছেন তাঁদের একটা প্রকাণ্ড সভা আছে। কৃষ্ণদাস বাবুর ক্ষমতা ও সৎচরিত্র দেখিয়া ইহাঁরা তাঁহাকেই আপনাদের সব কার্য্যের ভার দিলেন। এটী বড় সহজ কথা নয়। একজন গরিব দুঃখীর ছেলেকে সমস্ত রাজা ও জমীদারগণ যে এত বিশ্বাস করিলেন, এ কি বড় সামান্য কথা? আরও শুন। ইহাঁর পদ ও সম্মান বৃদ্ধি এখানেই শেষ হইল না। কলিকাতায় যে মিউনিসিপালিটী আছে, ইনি তাহার একজন অতি প্রধান মেম্বর হইলেন। কি আশ্চর্য্য! যেখানে যান, সেখানেই প্রধান,

সেইথানেই সর্ব্বেসর্ব্বা, সেইখানেই সকলের উপর। হাঁ! ইহাই ত চাই। একেই ত বলে বড়-লোক। আবও কথা আছে, কান পেতে শুন; এখান থেকে তাঁহাব পদ আরও কত বাড়িল এক-বাব দেখ। তোমবা বোধ হয অনেকেই জাননা যে এদেশেব গবর্ণব জেনারেল অর্থাৎ বড় লাট এবং লেপ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্ণব বা ছোটলাট, দুজনেবই সহায়তাব জন্য একটী করিয়া সভা আছে। প্রথম সভা থেকে বাঙ্গালা দেশের জন্য আইন তৈয়াব হয়। দ্বিতীয় সভা থেকে যে আইন হয় তা একে-বারে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য; ইহাকেই ভাবত-বর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট সভা বলা যায। ইহার মধ্যে প্রথমে কৃষ্ণদাস বাবু ছোটলাটের মন্ত্রীসভাব মেম্বর হন; সেখানে খুব দক্ষতাব সহিত কাজ করেন। তিনি যাহা ব'লতেন প্রায় তাহা আব কেউ কাট্‌তে পাবত না। তার পরে গত বৎসর ইহাঁর সম্মানের চূড়ান্ত হইযাছে,—বড়লাটেব মন্ত্রীসভাতেও ইনি একজন সভ্য হন! দেখিলে শুনিলেও চক্ষু জুড়ায়! একজন গরিব দুঃখী সামান্য লোকের ছেলে হয়েও লেখাপড়া, বুদ্ধি ও চরিত্রের তেজে মানুষ যে কত বড় লোক হইতে পারে তাহা ইনি বেস্‌ দেখাইয়াছেন। চক্ষু যদি থাকে ত দেখ, আর ইচ্ছা যদি থাকে ত হও। যদি একতিল পদার্থ থাকে, যদি মানুষ হইবার বাসনা থাকে, তবে প্রাণপণে যত্ন কব।

বড়লোক দুই জাতীয় দেখা যায়, এক জাতীয় লোকেরা ঈশ্বরের দ্বারা বড় হইয়াই জন্মান। যেমন শ্রীচৈতন্য, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি। ইহাঁদের মত হওয়া কঠিন, তবে চেষ্টা করিলে অনেকটা যে না হওয়া যায় তাও নয়। কিন্তু আব এক জাতীয় বড় লোকেরা আপনিই হন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাঁহারা নিজের চেষ্টায়, নিজের যত্নে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষায়, নিয়ত পরিশ্রম করিয়া কি উন্নতিই করিয়া যান। ইহাঁ-দের মত হওয়া তত কঠিন নহে, সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিলেই সব বুদ্ধিমান বালক সেই-রূপ মহৎ হইতে পাবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় এই বকম নিজেব চেষ্টায় বড় হইয়াছিলেন। চেষ্টা কবিলে আমা-দেব সখাব প্রত্যেক পাঠক সেইরূপ বড়লোক হইয়া স্বদেশেব ও জনক জননীব মুখ উজ্জল কবিয়া যাইতে পাবেন। একদিন ছেলেবেলা "হিন্দুপেট্রিযটেব" লেখা দেখিয়া এই কৃষ্ণদাস বাবুই বলিয়াছিলেন "আহা! কবে আমি এইরূপ ইংবাজী লিখিতে শিখিব?" তাব পব দেখ ২৩।২৪ বৎসব ধবিয়া ক্রমাগত সেই কাগজ থানিই তাঁহাব হাতে পড়িয়া দেশেব সর্ব্বপ্রধান কাগজ হইযা দাড়াইল। যথার্থই, একদিন যাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় আর একদিন তাহা সত্যই আসে। বালকগণ! তবে আব কেন? লেগে যাও, উঠে পড়—দিনবাত কেবল কিসে বড় হব' সৎ হব, ধার্ম্মিক হব, সেই চেষ্টা কব। যে কৃষ্ণ-দাস একদিন দুঃখীব সন্তান ছিলেন, তিনি আজ মরিবার সময় তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা রাখিয়া গেলেন! তাহাব মধ্যে পিতা, মাতা, কন্যা ও গরিবদিগের জন্য ১০০০০্‌ দশ দশ হাজার কবিয়া ৪০০০০্‌ চাল্লিশ হাজাব টাকা দিযা অবশিষ্ট তাঁহাৰ পুত্রকে দিয়া গিযাছেন। ধন্য কৃষ্ণদাস! তোমাকে আগে কেহ চিনিত না, আজ তুমি ছোটলাটের সম্মানিত ও বড়লাটের ডান হাত! তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরিশ্রম, তোমার যত্ন ও তোমার চেষ্টা, যেন আমাদের দেশের সব বালকেরা শেখে।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

পঞ্চম অধ্যায়।

খন ললিত বাবু অজাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দুর বাড়ীতে যান, তখন ইন্দু দাদার অপেক্ষায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। দাদাকে দেখিযাই ইন্দু বলিয়া উঠিলেন "দাদা! এই নাকি সেই ছেলেটী? আহা! একে এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন?" অজা সেখানে আসিযা কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হইযা পড়িল। ইন্দুরেখা তাহাকে কোলে করিযা পালঙ্কে লইযা শোয়াইয়া মাযের মতন ক'রে সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজার জ্ঞান হইল। সে চাহিয়া দেখে একটী সুন্দর সাজান ঘরে, সুন্দর পরিষ্কার বিছানায় শুইয়া আছে। এমন সুন্দর স্থান সে তাহার জীবনে কখন দেখে নাই। ফিরিয়া দেখে কাছে একজন (ঠিক যেন মায়ের মত) তার মুখপানে চাহিয়া আছেন; আর তার সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন। এই সব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইযা মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এই বুঝি স্বর্গ"! সে আস্তে আস্তে বলিল "এই কি স্বর্গ?" তাহার কথা শুনিয়া ইন্দুরেখা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "না বাছা! একি স্বর্গ? এ স্বর্গ নয়।" এই বলিয়া অজাকে এক বাটি গরম দুধ খাইতে দিলেন। তাহাকে দুধ খাইতে দেখিয়া ললিত বাবু বলিলেন "ইন্দু! ওকে একেবারে অনেক খেতে দিওনা। ওর কোন ভাল জিনিষ খাওয়া অভ্যাস নাই, অল্পে অল্পে খেতে দিও।"

ইন্দু। তা দিব। কিন্তু দাদা! এর কাপড় বড় ময়লা, এ কাপড় গুলো ফেলে দিয়ে একে স্নান করিযে দেব।

ইন্দুরেখা দেবী কাপড় খুলিযা তাহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তার গায়ের একটা ময়লা জামার পকেট হইতে একখানা ছোট খাতা বাহির করিয়া অজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানা কি তোমার খাতা?"

অজা। হাঁ। আসবার সময় ঠাকুর মা আমাকে এখানা দিয়েছেন।

"তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি আসি" এই বলিয়া নীচে গিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ দাদা! ও ছেলেটীর নাম কি?"

ললিতবাবু। ওর নামটাতো জানিনা। ওকে একটা নূতন নাম দিতে হবে। ওকে সকলে অজা বলে ডাকে, কিন্তু সেটাতো আসল নাম নয়!

ইন্দু। কাজেই একটা নাম দিতে হবে। আর দেখ ওর কাপড় এত ময়লা যে আর এক দণ্ডও বাড়ীতে রাখ্‌তে পারি না। আর ভাল কথা মনে পড়েছে। ওর একটা পিরাণের পকেটে একখানা ছোট খাতা পেযেছি; তাতে হয়ত ওর নাম লেখা থাকৃতে পারে।

ললিতবাবু। নিয়ে এস তো দেখি? নামটা হয়তো থাকৃলেও থাকৃতে পারে।

এখানে একটা কথা বলা উচিত; ইন্দুরেখার স্বামীর নাম রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনিও সেখানে বসিযা ছিলেন। ইন্দুরেখা দেবী উপর হইতে খাতা খানি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন, ললিত বাবু খাতা খানি খুলিয়া দেখেন, একটীও পাতা নাই। দেখিয়া বলিলেন "এতে কিছু নাই—নামটা তবে পাওয়া গেল না।"

রাজকুমার বাবু। দেখি! দেখি! থাকৃলেও থাকৃতে পারে। এই যে! এই যে! দেখি! অ—জি—ৎ—কু—মা—র—তার পর কি লেখা আছে পড়তে পারি না। প্রথম অক্ষরটা 'ব' তার পর কি পড়া যায় না।

ইন্দু। অজিৎকুমার বোধ হয ওরই নাম। অজিৎ থেকে অজা করে নিয়েছে। তাই হবে।

ললিত বাবু। ও মেয়েমানুষটী বোধ হয় ওর আপনার ঠাকুর মা নয়। আর ওর সঙ্গে কথা কইলেই বোধ হয, যেন কিছু লুকান কথা আছে। যা হোক ওর উপর চোক্ রাখতে হচ্চে।

কাল ললিত বাবু বাড়ী যাইবেন। ইন্দুরেখা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে স্বীকার করিয়াছেন যখনই ছুটী হইবে, তখনই সুরমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আসিবেন। ললিত বাবু যাইবার সময় দেখেন অজা চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। মুখ খানি প্রফুল্ল। হাসিটী মুখে ধরিতেছে না। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে-ছিলেন, দাদাকে দেখিয়াই উঠিয়া বলিলেন "দাদা! এখনই চল্লে না কি? আবার কবে আস্বে? শীঘ্রই এস। বৌদিদীকে অবিশ্যি অবিশ্যি সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

ললিত বাবু। আচ্ছা আর কতবার বল্‌তে হবে। ঢের হয়েছে। অজা! আমি যাচ্ছি কাকে কি বলতে হবে?

অজা। সকলকে বলবেন আমি এখানে বেস্ ভাল আছি, খুব সুখে আছি। আর মেনাকে বলবেন তাকে আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। সে যেন আমার জন্য না কাঁদে।

ললিত বাবু। এই। আর কিছু নয? ইন্দু, আমি তবে আসি।

ইন্দুরেখা দেবী দাদার সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত গেলেন এবং ললিত বাবু চলিয়া গেলে অজার কাছে আসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনেক দিন ধ'রে অজা রাজকুমার বাবুর বাড়ী আছে। সে রাজকুমার বাবুকে মেশো মহাশয় আর ইন্দুরেখা দেবীকে মাসী মা বলিয়া ডাকে। এখন অজাকে দেখিলে সে ছেলে বলে আর চেনা যায় না। সে এখন মোটা হয়েছে, লম্বা হয়েছে, তার শরীর পরিষ্কার, চুল পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কার। তার পা এখন আর খোঁড়া নয়। যেন সে অজাই নয়। অজার মুখে সর্ব্ব-দাই হাসি টুকু লাগিয়া আছে। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে পড়ান, সে এখন অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছে, শীঘ্রই কথামালা ধরিবে। অজা এখন "রাজা" কুকুরের সঙ্গে প্রত্যহ বিকালে বাগানে ছুটাছুটি খেলিয়া বেড়ায়। অজা এখন কত কি কাজ করে। পড়ে, লেখে, বাগানে ফুলগাছ বসায, গাছে জল দেয়, হাঁসকে খাবার দেয, আরও কত কি কাজ করে। অজার আজ কাল এক নূতন নাম হয়েছে। মাসী মা সে নামে ডাকলে অজা বড়ই খুসী হয়। সে নামটী অজিৎ। আজ অজা বাগানে ফুলগাছ পুতিয়া গাছে জল দিয়া রাজার সঙ্গে খেলা করিতেছে, এমন সময় মাসীমা বাগানের দিকে আসিতে-ছিলেন, অজাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "অজিৎ। এক খবর আছে শুনে যদি খুব খুসী হও, তবে আমায় কি দিবে?"

অজিৎ। মাসীমা! আর কি দিব? তোমায় কুড়িটী চুমো দিব। বল না! মাসীমা কি? আমার বড়ই শুন্‌তে ইচ্ছা করছে।

মাসী মা। কাল দাদা আর বৌদিদী এখানে আস্‌ছেন। এখনি একখানা চিঠি পেলাম।

অজিৎ। হো! হো! আমি এইবারে ইটের চকের খবর পাব। হো! হো। এইবারে দিদী-মার কথা, মেনার কথা শুন্‌তে পাব।—এই বলিয়া সে মাসীমাকে জড়াইয়া ধরিল। তার পর হাত তালি দিয়া বাগানময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজার সঙ্গে খেলা দূরে গেল। রাজা বেচারি আর কি করে? অজিৎ নাচিতে নাচিতে যেখানে যায়, সেও তার পিছন পিছন ছুটিয়া গিয়া তার পায় কামড়ায়। অজিতের

নাচ দেখিযা ইন্দুবেখা দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "অজিতেব আমার নাচ দেখ। এখনও ইটেব চকেব কথা ভুলিতে পাবে নাই! নাচটা একটু থামাও দেখি ?"

অজিৎ। মাসীমা! মামাবাবু আমায় দেখলে চিন্‌তে পাববেন না। আমি এখন দেখ্‌তে আব এক বকম হ'য়ে গেছি, না ?

মাসীমা। বোধ হয চিন্‌তে পাববেন না। তুই একেবাবে বদ্‌লে গেছিস্। তোকে যখন চিন্‌তে না পেবে জিজ্ঞাসা কবিবেন 'এ কে ইন্দু ?' তখন আমি বলব 'এ সে অজা নয়—তাকে তাড়াইয়া দিযাছি।' কেমন ? না। না। আমি বলব এই আমাব লক্ষ্মীছেলে "অজিৎ-ধন"। এই বলিযা তিনি অজিতেব মুখে একটী আদবেব চুম্বন দিলেন। যখন ইন্দুরেখা দেবী অজিতেব সঙ্গে আদব ক'বে কথা বলিতেন, তখনই তুই বলিযা কথা কহিতেন। এটাও ওঁব আদবেব ডাক। এইরূপে অজিতেব সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইযা আসিল। ইন্দুবেখা দেবী চাহিযা দেখেন সন্ধ্যা হইয়াছে। অল্পে অল্পে অন্ধকাব চাবিদিক ঢাকিযা আসিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে কাক "কা" "কা" কবিয়া উড়িয়া বাসায যাইতেছে। সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া তিনি চমকিযা বলিলেন "ওমা! কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িযাছি। চল অজিৎ! বাড়ী ফিবিয়া যাই। এতক্ষণ তোমাব মেসো মশাই এসেছেন। না! আসেন নি; এলে খবর পেতাম।" এই বলিয়া দ্রুত পদে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অজিৎ আগে আগে ছুটিয়া বাড়িতে পৌছিল।

"বাবা আমায় রেখে গেছেন।"

জাহাজে ঠিক বাড়ীবই মত তলা থাকে। বড় বড় বাড়ীতে যেমন একতলা, দুতলা, তিনতলা থাকে তেমনি জাহাজেও একতলা, দুতলা, তিনতলা প্রভৃতি তলা থাকে। জাহাজে এমনও অনেক যায়গা আছে যেখানে কেহ বড় একটা যাওয়া আসা কবে না। একবাব একখানি জাহাজেব এক কোণে ৮। ৯ বৎসবেব একটী ছোট ছেলে দুই তিন দিন ধবিয়া চুপ কবিযা বসিযাছিল। তাব কাছে কিছু খাবাব ছিল, সে ক্ষুধা পাইলেই তাহা বাহিব কবিযা খাইত। দুই তিন দিন তাহাকে কেহই দেখিতে পায নাই। তাব পব চাবিদিনেব দিন যখন জাহাজ সমুদ্রে আসিযা পড়িযাছে, তখন এক-জন তাহাকে দেখিতে পাইযা কাপ্তেনেব কাছে গিয়া বলিল "মহাশয! জাহাজেব নীচেব তলায় একটী ছেলে কোণে লুকাইযা বসিযা আছে, সে আমাদেব জাহাজেব লোক নয। দেখিবেন আসুন।" কাপ্তেন এই কথা শুনিযা তাহাব সঙ্গে গিয়া দেখিলেন ছেলেটী কোণে চুপ কবিয়া বসিয়া আছে, দেখিযা তাহাকে বাহিব হইযা আসিতে বলিলেন। তাহাকে দেখিয়া কাপ্তেনেব অত্যন্ত বাগ হইযাছিল। তিনি বাগে চীৎকাব কবিযা বলিলেন "তুই কোথা থেকে এলি ? তুই না ব'লে কেন এ জাহাজে চড়্‌লি ? দুষ্ট ছেলে! বল্ কেন তুই এখানে লুকাইযা বহিয়া-ছিস্ ? বল্, শীঘ্র বল্ এখানে কেন ?" বালক ভযে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "বাবা আমায় বেখে গেছেন।"

কাপ্তেন। কি ? মিথ্যা কথা। বাবা তোকে বেখে গেছেন ? বল্ কেন এখানে এলি ?

বালক। কাপ্তেন! বাবা আমায বেখে গেছেন।

কাপ্তেন। ফেব ? ফেব ? 'বাবা আমায় রেখে গেছে' ? এবার ও কথা বলেছিস্ কি মেবেই ফেল্‌ব।

বালক। না কাপ্তেন! বাবা আমায় বেখে গেছেন।

কাপ্তেন বাগে চাবিদিক অন্ধকাব দেখিতে লাগিলেন। চোক্ কান দিয়া আগুণ বাহির হইতে লাগিল। রাগে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থর্ থর্ কবিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি সজোরে

বালকেব ছোট ছোট রোগা দুখানি হাত ধরিয়া অত্যন্ত ঝাঁকুড়াইতে লাগিলেন, আর সিংহের মত চীৎকাব করিয়া বলিলেন "ফেব ও কথা! আবার মরতে সাধ গিয়েছে? আবার ও কথা বল্‌বি কি মেবেই ফেল্‌ব। বল্ হতভাগা, এলি কেন?"

বালক কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "আমি আসি নাই, বাবা বেখে গেছেন।"

কাপ্তেন। তবে কি মব্‌বি? মব! নিয়ে এস দড়ী। আজ এব মৃত্যু উপস্থিত। কে বাবণ কবে?

পার্শ্বেব লোকেবা কাপ্তেনেব ব্যবহাবে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইযাছিল; কেহ তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইতে অগ্রসব হইল না। কাপ্তেন ফের চীৎকাব কবিয়া বলিলেন "তবে কেহ দিবে না? আমিই দিব।" এই বলিয়া যাই তাহার দুই হাত ধরিয়া উঁচু কবিয়াছেন অমনি ছেলেটী বলিয়া উঠিল "কাপ্তেন! আমাকে মাববেন? আমি সত্যই বলিয়াছি, বাবা আমায় বেখে গেছেন। তা মবিবাব আগে ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। তবে আমি প্রার্থনা কবি?"

কাপ্তেন। কব্।

বালক হাত দুখানি জুড়িযা চক্ষু দুটী বন্ধ কবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানেব নিকট এই প্রার্থনা কবিল "হে ঈশ্বব! আমি যে সত্য বলিতেছি তুমিত তা সব জান। আমি যদি মরি তবুও হে ঈশ্বব! সত্য কথাই বলিব। আমি জানি সত্য বলিলে তুমি ভাল বাস। তবে আমি মবি। তুমিত আমায় ভাল বাস, মরিলে তোমার কাছে যাব, তাহলে আমার কিসের দুঃখ?"

প্রার্থনা শুনিয়াই কাপ্তেনের পাষাণ মন গলিয়া গেল। তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁর কথা যেন কে বন্ধ করে দিল। বালকটী বাঁচিয়া গেল। তবে নাকি মিথ্যা কথা না হইলে চলে না? তবে নাকি ভগবান প্রার্থনা শুনেন না? তবে নাকি ঈশ্বর আমাদের ভাল বাসেন না? তবে নাকি সত্য কথার পুবস্কাব নাই? নাই?? কে বলিল নাই? আছে! সত্য কথা বলি ত ভয় নাই! সত্যেরই জয় হয় জানিও। সত্যসত্যই এই ছেলেটীর পিতা তাহাকে এই জাহাজে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গরিব মানুষ, ছেলেকে খাইতে দিবাব ভয়ে তাহাকে জাহাজে বাখিয়া যান; মনে কবিয়াছিলেন যে জাহাজ সমুদ্রে বাহিব হইযা পডিলে আব তাহাকে ফিবাইয়া দিতে পাবিবে না, কাজে কাজেই তাহাকে একটা কাজ দিয়া খাইতে দিবে। কাজেও তাহাই হইল। বালকের মৃত্যু হইল না।

ধাঁধা।

গতবাবের প্রশ্নগুলিব উত্তব।

১। মাস। ২। নৌকা। ৩। (১) ম। (২) লজ্জা। ৪। দুজনকেই কুমাব বলে। ৫। ঘুম। ৬। মাছ-বাঙ্গা।

নূতন।

১। তিনটী অক্ষর মম সুগোল শবীবে—
প্রথম ছড়িলে পরে কেহ না আদবে;
দ্বিতীয় ছাড়িয়ে, দেখ! সকলেই কবি—
শেষ ছেড়ে ভেঙ্গে খেয়ে মুখ চুল্‌কে মবি।

২। মস্তকেতে দীপ্তি ছিল, দুষ্টলোকে কেড়ে নিল
তখনই লাগিলাম কাজে;
মধ্যদেশ কবি ছেদ পাষণ্ডে করিল ভেদ
চেয়ে দেখ খাদ্য দ্রব্য সাজে।
পদ কাটি খান খান কবিল বিঁধিযা বাণ
বোঝা হযে পড়িলাম খসি;
বালক বালিকাগণ, বল, স্থিব কবি মন,
কে আমি, পবের আজি দাসী?

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজার ছুটী উপলক্ষে সখার গ্রাহক এবং গ্রাহিকাগণের মধ্যে অনেকেবই আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এখন যে স্থানে আছেন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী বা অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনা; এই জন্য আমরা আগামী (অক্টোবার)মাসের সখা উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির না করিয়া উক্ত মাসের শেষ সপ্তাহে বাহির করিব।

সখা কার্য্যালয়
২নং বেনিয়াটোলা লেন
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শ্রী[illegible] দাস দ্বারা প্রকাশিত

দ্বিতীয ভাগ । অক্টোবব । ১০ম সংখ্যা ।

খুঁতধরা ছেলে।

বিলাতে চাবিটী ভাই একদিন এক যাযগায বসিযা কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাদেব আলাপেব বিষয, কে কি কবিবে। সকলেবই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওযা চাই। সকলেব 'একটা কিছু' তো আব এক বকম হয না। তাই চাব ভাই চাব বকম কথা বলিল।

একজন বলিল—"আমি ইটেব কাববাব কবিব। তাহাতে টাকা হইবে, আব ইট দিযা আমাব একখানা বাড়ী কবিব।"

আব একজন বলিল—"দূব হ, তোর নেহাত ছোট নজব। আমি তোব চাইতে বেশী একটা কিছু হ'ব—আমি ইঞ্জিনিযাব হ'ব। কত লোক আমার কাছে ঘববাড়ীব নক্সা কবিযা নিতে আসিবে, কত লোকেব বাড়ী-ঘর বাঁধিযা দিব। আমি একটা "দশজনেব একজন" হইব। বলিস্ কি, আমার নামে একটা ষ্ট্রীট যদি না হয, তখন দেখিস্।"

তৃতীয় ভ্রাতা—"বিল্ডার, কণ্ট্র্যাক্টব, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক। তোবা হ'বি চিনিব বলদ। আমি কি করিব জানিস্। আমি অন্তেব কাজ নিযে ছুটোছুটী কবিতে যাইব কেন। সব কাজে আমাব নিজেব বুদ্ধি খাটিবে। সব নূতন ফ্যাসানে বাড়ী ঘব কবিব। আমাব সব এমন হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই।"

শেস ব্যক্তি উঠিযা বলিল "তোবা যাহাই কবিস্ ভাই, এমন কিছু কবিতে পাবিবি না যাহাব উপব আমাব বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল, দেখ্ দেখি। তোবা যাহা কবিবি, আমি তাহাব দোষ ধবিব। আমাব কাজেব আব অভাব কি?"

চাবি ভা'যেব পবামর্শ ঠিক হইল। একজন ইটেব কাজ কবিযা কিছু টাকা কবিল। ইট দিযা তাহাব একটী বাড়ী হইল। তা ছাড়া এক দুঃখিনী বুড়ীকে ঐ ইট দিযা আব একটী ঘব কবিযা দিল। কণ্ট্র্যাক্টব ইঞ্জিনিযাব ইত্যাদি মহাশযও কথামত কাজ কবিলেন। মিউনিসিপালিটিকে খোঁচাইযা নিজেব নামে একটী ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত কেমন কবিযা কবিয়া লইযাছেন। তিনিও একটা কিছু হইযাছেন। তৃতীয় বেচাবা নূতন ধবণে বাড়ী করিতে গিয়া চাপা পড়িযা মবিল। খুঁত-ধবা মহাশযেব তো কথাই নাই। তাহাব কাজ ফুবাযই না। মবিবার সময় পর্য্যন্ত সে সন্তোষ-জনকরূপে, প্রশংসাব সহিত কর্ত্তব্য-কাজ করিযা গেল।

এক দিন স্বর্গের দরজায় দবোয়ান দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্ম্মার হাতেব তৈবি। বুঝিতেই তো পাব, স্বয়ং বিশ্‌করম ঠাকুব যাহা করিযাছেন সে কেমন সুন্দব। এত সুন্দব যে আব কি বলিব! দবজায প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুখানা কাচ লাগান। তাহাব ভিতব দিয়া দবোযান ঠাকুব কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা কবিতেছিলেন না। অনেক কাল হইল স্বর্গে লোক আসে না, তাই আজ কাল কাজেব ব্যস্ততা কিছু কম। দেবতা দবজা খুলিবাব হীবাব হ্যাণ্ডেলে হাত ঝুলাইয়া সোণাব টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন। এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ কবিযা দবজায ঘা মারিবাব শব্দ হইল। বাহিব হইতে একজন লোক বলিতেছেন—

"অনুগ্রহ করুন মহাশয, আমি ভিতবে আসিতে প্রার্থনা কবিতে পাবি?—দবজাগুলিতো মন্দ নয, কিন্তু স্বর্গের দ্বাব বন্ধ থাকিবে কেন? দবজাগুলি আবো বড় হওযা উচিত।"

"তুই কেবে, পৃথিবীব লোক ক্যাচ্‌ ম্যাচ্‌ কবিযা কথা কহিতেছিস্‌?"

"অত মোটা সুবে বলিতেছেন কেন?—আমি স্বর্গে যাইতে চাই।"

"বটে? তুই কবিয়াছিস্‌ কি?"

"আমি খুঁতধবা কাজ কবিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ কবিয়াছে তাহাব সমস্ত দোষ আমার নোট বহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইট পোড়াইযাছিল সে আব দুই মণ কয়লা কম খরচ কবিলে সুরকীওযালা সহজেই খোওযা করিতে পারিত। যাব নামে ষ্ট্রীট হইযাছে সে এত রোগা যে অত বড় ষ্ট্রীটে তাহার কিছু দরকাব নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে—"

"আরে থাম্‌ থাম্‌; ও সব কি কাজ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্‌?"

"এই সব নোট লিখিযাছি।"

"দুব হ ব্যাটা, তুই কি আব কোন কাজই কবিস্‌ নাই? কেবল দোষ ধবা কাজই কবিযাছিস্‌?"

"আর স্মৃতি পুস্তিকায তাহা লিখিযাছি।"

"যা, যা। তোব এখানে আসিবাব হুকুম নাই। "ঝাউ পচাবিব কাক্কু, 'জগনাথক্কু——'" বলিযা দবোযান দেবতা গান ধবিলেন। আমাদেব সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খবচ, বেলভাড়া, গাড়ী ভাড়া কবিযা আসিযাও কোন ফল পাইলেন না। বিবক্ত হইয়া মনে কবিলেন যে কাগজে লেখা উচিত 'স্বর্গে ভাল অভ্যথনাব বন্দোবস্ত নাই'। গাডী পাইতে অনেক দেবী, সুতবাং ইত্যবসবে দবজাব দোষগুলি টুকিযা বাখিতে লাগিলেন। দবজাব কথা শেষ হইলে সাহেব দ্বাবী ঠাকুবেব গানেব এক মজাব বর্ণনা লিখিতেছিলেন, এমন সময দেখিলেন যে, যে বুড়ীকে তাহাব ভাই ঘব কবিয়া দিযাছিল, সে আসিতেছে। তিনি আশ্চর্য্য হইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন

"ও বুড়ী। তুই কেমন কবিযা আসিলি?"

"তাই তো বাপু, আমি তো কিছু জানি না। আমি গবিব দুঃখিনী বুড়ী, এমন তো কিছুই কবি নাই যাহাতে এখানে আসিতে পাবি।

"তুই কি কোন কাজই করিস্‌ নাই? আমি তো সমালোচনা করিযাছি।"

"আমাব আব তো কিছুই মনে হয না। তবে একদিন আমাব বাড়ীব কাছে পুকুরে জমা বরফেব উপবে পাড়াব সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবার সময় আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্টি কথা কহিয়া গেল। আমি ভয়ানক কাতর ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে এক রকম মেঘ দেখা দিয়াছে। ওরূপ মেঘ আমার জন্মে আমি আর একবার দেখিয়াছিলাম। তখন দুই মিনিটের মধ্যে সমুদায় ববফ কাটিয়া গিয়াছিল। আমার

মনে বড় ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি। রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনিবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলাম। সকল লোক বুড়ী পুড়িয়া মরিল মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি তার পর কি হইল বিশেষ জানি না। কেবল মাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম "কার কিছু হয় নিতো?" একজন লোক বলিল 'না, আমরাও আসিয়াছি আর বরফ ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তার পর আর কিছু জানিনা। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।"

বুড়ীর কথা শুনিয়া দরোয়ান দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে দেবতারা আসিয়া "এসো এসো বুড়ী এসো" বলিয়া আদর করিয়া বুড়ীকে স্বর্গের ভিতর লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ী সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল:—"ওর ভাই আমাকে বাড়ী করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার যায়গা ছিলনা। ও মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া যাইবে, আর আমি কোন্ প্রাণে তোমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। আমাকে তোমরা স্বর্গে নিও না। এ বেচারা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাবে।"

তখন দেবতারা সমালোচককে বলিলেন—"অলস! অপদার্থ! যা! বুড়ীর জন্য তোকে স্বর্গে নিয়া যাওয়া হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্ব্বে স্বর্গে যায় নাই।"

দেবতারা তার পর বুড়ীর সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবার মাত্র বলিল। "টানিয়া নেওয়া বুঝি তোমাদের অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া টানা হইতেছে না। এমনি ক'রে বুঝি টানে?"

ঢেঁকি যেখানেই যাক্, তার ধান ভানা কাজ ঘোচেনা, আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত, আর কিইবা করে, একটা কাজ তো চাই? কতকগুলি ছেলে আছে, তারা কেবলই খুঁত ধরে, **পরের দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করার চেয়ে নিজের দোষ শোধরাইয়া পরের গুণ দেখা ভাল।**

মার্কিন মহিষ।

সুন্দর বনের বড় বড় জঙ্গলে, যেখানে সাপ বাঘের আড্ডা, যেখানে গাছের ডালে ডালে বুনোপাখীর মজলিশ, যেখানে নদীতে হাঙ্গর, কুমীর হা করিয়া থাকে এবং অনেক সময় ডাঙ্গা পর্য্যন্ত মানুষকে তাড়া করিয়া যায়,—সেইখানে বড় বড় বুনো মহিষের দল আপনার মনে চরিয়া বেড়ায়। দেখিতে কালো ভূতের-মত, মস্ত ঢাকের মত মাথার মাঝে দুপাশে দুটো চোখ মিটির মিটির করিতেছে, দেড় হাত দু হাত লম্বা এক একটা শিং;—সেই শিং নাড়িতে নাড়িতে মাঝে মাঝে এক একবার বাছুরের মত শব্দ করিতে করিতে, যমের মত জানোয়ারগুলো যখন গাছপালা ভাঙ্গিয়া, নদী খাল সাতরাইয়া ক্ষেত আবাদ নষ্ট করিয়া চলিতে থাকে, তখন বাঘেরও প্রাণ উড়িয়া যায়, কুমীরেরও মুখ কালো হইয়া যায়,—আর আশে পাশে যে সব মানুষ থাকে, তাদেরতো কথাই নাই! তারা যে কোথায় গিয়া রক্ষা পাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের

সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে মহিষ যম-রাজের বাহন। না হবে কেন। দেবতাটীও যেমন, বাহনটীও তেমনি।

কিন্তু আমাদের দেশের গয়লারা যে মহিষ পোষে, তাহা দেখিয়া বুনো মহিষ যে কি তাহা বোঝা যায় না। আবার আমাদের দেশের বুনো মহিষ দেখিতে যেরূপ ভয়ানক, তাহা দেখিয়াও আমেরিকা বা মার্কিনদেশের মহিষের চেহারা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। ইংরাজীতে মার্কিন মহিষকে বাইসন্ বলে। সে বৎসর চিয়ারিণী সাহেবের সার্কস্ বা ঘোড়ার নাচে একটা বাইসন্ আসিয়াছিল। আমরা সেটাকে দূরের দেখিয়াছি। সেটা দেখিতে আমাদের মহিষের মত উচু নয় বটে, কিন্তু গায়ে এত জোর, যে সার্কসের প্রদর্শনী চক্র অর্থাৎ গোলাকার ঘেরা যায়গা হইতে প্রায় ১৫।১৬ জন লোককে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল, কেহই তাহাকে দড়ী ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

আমেরিকা দেশে এমন সকল স্থান আছে যেখানে কেবলই মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, এবং তাহাতে কেবলই লম্বা লম্বা ঘাস। ঘাস গুলি বুঝি কম লম্বা মনে ভাবিতেছ? বড় সোজা কথা নয়, সে গুলো এত লম্বা যে মানুষ ডুবিয়া যায়, এবং একবার তাহার মধ্যে গিয়া পড়িলে, ঠিক ঠিক করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসা কষ্ট। এই ঘাসবনে ব্যাঘ্র, গোবাঘা, প্রভৃতি মহাশয়েরা সুখে বাস করিয়া থাকেন। আমাদের মার্কিন মহিষ মহাশয়ও এইখানে থাকিতে ভাল বাসেন। পাহাড়ে বা কোন জঙ্গলে থাকিতেও তাঁহার আপত্তি নাই তবে তিনি কেবল এই চান যে স্থানটী এমন হইবে যেন মানুষগুলো গিয়ে তাঁহাকে বিরক্ত না করে। মানুষগুলো কি তা শোনে না বোঝে!

সেই ঘাসবনে, সেই পাহাড়ময় স্থানে, সেই ভয়ানক জঙ্গলে মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষ ধরিতে যায়। মহিষ ধরিতে গিয়া মানুষও ছু

একবাব ধবা পড়েন—কখনও প্রাণ যায, কখনও হাত পা ভাঙ্গিয়া বক্ষা পান। মহিষ কি সহজে ধবা দেয়। দলে দলে শিকাবী ঘোড়ায় চড়িয়া, দড়ী হাতে কবিষা আসিতেছে দেখিলেই মহিষেবা দলশুদ্ধ দৌড়িয়া পলাইতে থাকে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িযা যাহাঁরা আসিতেছে, তাহাদেব সহিত দৌড়িযা পাবিবে কেন? শিকাবীবা শীঘ্রই নিকটে আসিযা পড়ে। তাহাদেব হাতে যে দড়ী থাকে, তাহাব এক পাশ ঘোড়াব গলায বা শিকাবীব কোমবে বা হাতে বাঁধা আব এক পাশে ফাঁসী কবা, শিকাবীদেব হাতেব এমন কৌশল যে সময বুঝিযা যাই দড়ীটা ছুঁড়িযা দেয়, অমনি তাহা মহিষেব গলায বা পাযে জড়াইযা ফাঁসী লাগিযা যায। এ দিকে দড়ীব আর এক দিক শিকাবীব কাছে বা সচবাচব ঘোড়াব গলায বাঁধা আছে। সেই দড়ী ধবিযা ঘোড়া মহিষকে টানিযা লইযা যায। মার্কিন মহিষ দেখিতে যত ভযানক, তত সাহসী নয়। দলছাড়া হইযা সহজেই ভয় পেযে উঠে, কাজেই শিকাবীবা যেমন টানিযা লইতে থাকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে,— তবে দু একটা দু একবাব ধ্বস্তাধ্বস্তি কবিয়া, দু এক ঘা না খাইযা ও না দিয়া মানুষেব বশে আসে না। ফাঁসি দিয়া ধবিবাব নিযম আজ কাল বড একটা নাই; এখন অসভ্যেব তীব ধনুকে এবং সুসভ্যের গোলা গুলিতে অতি সহজেই মার্কিন মহিষেব পশু-জন্ম শেষ হয়। মার্কিন মহিষের হাড, মাংস, চামডা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জিনিষই কোন না কোন কাজে লাগে, এই জন্যই মানুষ অত কষ্ট করিয়া মহিষ শিকার করে।

মার্কিন মহিষ পরমেশ্বরের এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি, তিনি যে কত স্থানে কত চমৎকার দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সীমা কি। আমরা যে ছবি দিলাম তাহা দেখিলে ওরূপ জীব যে সত্য সত্যই আছে, তাহা কি সহজে বিশ্বাস কবিতে পাবা যায়? কিন্তু পবমেশ্বরেব সৃষ্টিতে সকলই সুন্দব, সকলই চমৎকাব। আমবা যতই দেখিতে থাকি, ততই আশ্চর্য্য বোধ হইতে থাকে, আব মনে হয়, এ পৃথিবীতে কত কি আছে, আমবা তাহাব কিছুই জানিনা।

মিছা কথা কহিও না।

সাধন কখন মিছা কথা কয়না। তাহাব অন্য অনেক দোষ থাকিতে পাবে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে মিছা কথা কহিতে শুনে নাই। সুতবাং তাহাব সমস্ত দোষ থাকিলেও গ্রামেব লোক তাহাকে একটু ভাল বাসে। তাহাব পিতা দেশে থাকেন না, এজন্য বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায ছেলেটী দুষ্ট হইযা পড়িযাছে। এবাব তাহাব বাপ বাড়ী আসিয়া তাহাকে আদব কবিযা অনেক ভাল ভাল জিনিস কিনিযা দিলেন, আবও বলিলেন যে সে যাহা চাহিবে তাহাই দিবেন যদি সে মন দিয়া পড়াশুনা কবে ও তিনি যাহা বলিবেন তাহা শুনে। সাধন স্বীকাব কবিল। তিনি নূতন নূতন বেশ বঙ্গীন বৈ কিনিয়া দিলেন ও বাড়ীতে বসিযা পড়িতে বলিলেন। গ্রামেব ৪। ৫ জন ভাল ছেলে ভিন্ন আর কাহাবও সহিত খেলা কবিতে নিষেধ কবিলেন। এইরূপে কয়েক দিন কাটিযা গেল, সাধন মন দিযা পড়ে, পড়া হইলে ঐ সকল ভাল ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে ও উত্তম উত্তম কাপড় চোপড় পরে, উত্তম উত্তম খাবার খায়। মনে খুব আহ্লাদ। দুষ্ট ছেলেরা তার পিতার ভয়ে আর নিকটেও যায় না।

এক দিন তাহার পিতা কোথা যাইবেন, তাই যাইবার সময়ে বেশ্ করিয়া সাধনকে বলিয়া গেলেন। সমস্ত দিনে যে সকল কার্য্য করিতে

হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন, বিশেষ করিয়া বলিলেন যেন সব কুচরিত্র বালকদের সঙ্গে খেলিতে না যায়। তিনি চলিয়া গেলে ঐ সকল দুষ্ট বালক সুবিধা পাইয়া চারিদিক হইতে উঁকী মারিতে লাগিল, শিশ্ দিতে লাগিল, ও নানা রূপে সাধনকে ডাকিতে লাগিল। সে প্রথম প্রথম শুনিয়াও শুনিল না, পিতার উপদেশ মনে করিয়া সে সকল ছেলেদের দিকে চাহিলও না। অনেক ক্ষণের পর একবার যেই সেদিকে ফিরিয়াছে, অমনি তাহারা সকলে বলিল "একবার নামিয়া আইস, একটা কথা শুনিয়া যাও।" সে যাইতে অস্বীকার করিল, তখন তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "কেবল একটী কথা শুনিয়া যাও।" এক শ বার এই কথা বলিতে বলিতে সাধনের মনে হইল, একবার ত যেতে হানি নাই। খেলিতেই নিষেধ, দেখা করিতে ত মানা নাই। এই মনে করিয়া সে বাহিরে আসিল। তখন ঐ সকল বালকেরা মায়া কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "কি ভাই! একেবারে আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে? একটীবারও কি আমাদের দেখা দিতে নাই? এতদিনের ভাব কি একেবারে চিরকালের জন্য গেল? তুমি পড় না, তাতে ত আমরা বারণ করি না, কিন্তু তুমি না হলে আমাদের খেলাই হয় না। আমরা তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" ইত্যাদি কত সব কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক সাধন মহা বিপদে পড়িল। তাহার এমন সাহস হইল না যে সে বলে "না ভাই তোমরা মন্দ, তোমাদের সঙ্গে খেলিব না, তোমরা ভাল হও, তার পরে খেলিব।" এ না বলিয়া সে বলিল "বাবা বকেন, তোমাদের সঙ্গে বেড়াইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন।" অমনি তাহারা বলিল "আজি ত আর তিনি বাড়ী নাই, চলনা কেন যাই। আজ আমরা চাটুর্য্যেদের বড় বাগানে চড়াইভাতী করিব, আজ তোমার নিমন্ত্রণ। সেখানে যেতেই হবে।" সাধন চুপ করিয়া রহিল। দুষ্ট বালকেরা সুবিধা বুঝিয়া "হৈ হৈ" শব্দে সকলে চীৎকার করিয়া তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। সে অনেক বলিল "মাকে বলিয়া আসি," কিন্তু তাহার কথা ছেলেদের গোলে ডুবিয়া গেল।

বাগানে আজ মহা ধুম ধাম। ২০।২৫ জন ছেলে মত্ত আমোদে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতেছে। এক দিকে জন কতক ছেলে কি বাটিতেছে, কোথাও কজন বেশ্ মনের আনন্দে বসিয়া গল্প করিতেছে, এক কোণে ৪ জন বালক দাঁড়াইয়া কাষ্ঠ ভাঙ্গিতেছে, কোথাও বা চাল ডাল সব ধুইতেছে। সব ব্যস্ত, সব আনন্দিত, সব খুসী। এত আমোদের ভিতরে পড়িয়া আর কতক্ষণ সাধন মলিন মুখে থাকিবে? তাহার ভয় ক্রমে দূর হইল, "যা হবার তা হবে এখন, এখন ত আমোদ করা যাক।" সেও তাদের সঙ্গে মিশিয়া খুব মাতিয়া গেল। আর আর ছেলেরা তাকে খুসী করিয়া ভুলাইয়া রাখিবার জন্য আরও বেশী যত্ন করিতে লাগিল। তাহার মনের তখন আর এক ভাব। এতদিন আলাদা থাকিয়া পিতার সৎকথায় যে কিছু উপকার হইয়াছিল, তাঁহা সব যেন বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। তাহার তখন ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তাহার বাপ আর বাড়ীতে না আসেন, আর সে মনের আনন্দে সঙ্গীদের সহিত খেলাধূলা করে। উঃ! কুসঙ্গের কি ভয়ানক ক্ষমতা! কুসঙ্গে কি সর্ব্বনাশই হয়! পিতার এত সৎ উপদেশ, এত ভালবাসা, এত যত্ন, এত ভাল ভাল খাবার দেওয়া, সব ভাসিয়া গেল! দুষ্ট বালকদের সঙ্গে পড়িয়া সাধন আবার মজিল।

আমরা ছেলেবেলা একটা গল্প শুনিয়াছিলাম যে একজন ঘেসেড়া ঘাস কাটিতে গিয়া হঠাৎ